জাপানি শিশুতোষ লোকগল্প

কবীর চৌধুরী

২০-৮১

জাপানি শিশুতোষ লোকগল্প

কবীর চৌধুরী

ছবি : হাশেম খান

[কিছু ছবি জাপানি শিল্পী ইউশিসুকী কুরোসাকীর

ছবি অবলম্বনে অঙ্কিত]

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
বাস্তবায়নে : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

উৎসর্গ

কিশোরকাল থেকে প্রগতিশীল
সাংবাদিকতায় আন্তরিকভাবে
নিয়োজিত স্নেহভাজন
শফিকুল ইসলাম ইউনুস

সূচিপত্র

জেলিফিশের কেন হাড় নাই	৪	সাগর পাড়ি দেয়া খরগোশ	৩৩
ভাগ্যবান খড় সাহেব	৭	জিহ্বা কাটা চড়ুই পাখি	৩৫
ব্যাজার আর মায়াবী পাখা	৯	লম্বা নাকের দুই ভূত	৩৮
বাঁদর নাচ আর চড়ুই নাচ	১২	দৈত্য ও রাতা মোরগ	৪০
মায়াবী চায়ের কেৎলি	১৫	হাঁদারাম সাবুরো	৪২
লেজকাটা বানর	১৯	ক্ষুদে এক ইঞ্চি	৪৪
পীচ বালক	২৩	আঠালো পাইন গাছ	৪৭
কৃতজ্ঞ ছয় মূর্তি	২৬	তাঁতি মাকড়সা	৪৯
কাঁকড়া ও বানর	২৮	দাঁত খিলালের ক্ষুদে যোদ্ধারা	৫৩
ফুল ফোটানো বুড়ো	৩০	চাঁদের বুকে খরগোশ	৫৫

জেলিফিসের কেন হাড় নেই

বহু বহু কাল আগে সাগরের সব প্রাণী সাগরের গভীর অতলে ড্রাগন রাজার প্রাসাদে মিলেমিশে সুখে-শান্তিতে বাস করত। সব মানে প্রায় সব। প্রাসাদের বৈদ্য ছিল অক্টোপাস। সে জেলিফিসকে দু'চোখে দেখতে পারত না। তখনো জেলিফিসের গায়ে অন্য সব প্রাণীর মতোই অস্থি ছিল।

একদিন ড্রাগন রাজার মেয়ে খুব অসুস্থ হয়। অক্টোপাস রাজকন্যাকে দেখতে আসে। সে জানাল যে, রাজকন্যাকে যদি বানরের কলিজা দিয়ে তৈরি একটা ওষুধ না খাওয়ানো যায় তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। রাজবৈদ্য অক্টোপাস রাজাকে বলল, 'জেলিফিস তো খুব ভালো সাঁতার জানে। তাকে সমুদ্রের ওপার থেকে বানরের কলিজা নিয়ে আসার জন্য পাঠানো যায়, মহারাজ।'

রাজা বললেন, 'তাই করা হোক।' তিনি জেলিফিসকে ডাকিয়ে এনে তাকে ওই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিলেন। কিন্তু কাজটা সহজসাধ্য ছিল না। জেলিফিস দিনের পর দিন সাঁতার কাটার পর অবশেষে একটা ছোট্ট দ্বীপের কাছে একটা বানরের দেখা পেল। সে একটা দুর্ঘটনার ফলে সমুদ্রের বুকে পড়ে গিয়েছিল।

বানর সাঁতার জানত না। সে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে, 'বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছো, আমাকে বাঁচাও।'

জেলিফিস বানরকে বলল, 'আমি তোমাকে বাঁচাতে পারি কিন্তু একটা শর্ত আছে। তুমি আমাকে তোমার কলিজাটা দেবে। ড্রাগন রাজার মেয়েকে বাঁচাবার জন্য ওটা দরকার।'

বানর কথা দিল। জেলিফিস বানরকে তার পিঠে নিয়ে সাঁতরে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল।

তখন সাগরের অতল জলে পড়ে গিয়ে সাঁতার না জানা বানর প্রাণরক্ষার জন্য সব কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দানে রাজি ছিল, কিন্তু বিপদ কেটে যাবার পর নিজের কলিজা দেবার ব্যাপারটা তার আর ভালো লাগে না। বিষয়টি নিয়ে সে যত ভাবে তার তত খারাপ লাগতে থাকে। অবশেষে সে স্থির করল, না, তার কলিজা সে দিতে পারবে না, ড্রাগন রাজার মেয়েকে বাঁচাবার জন্যও না।

বানরের বুদ্ধি ছিল খুব তীক্ষ্ণ। সে জেলিফিসকে বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও ভাই। এই মাত্র আমার মনে পড়েছে যে আমি আমার কলিজা দ্বীপের একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে এসেছি। আমাকে দ্বীপে নিয়ে চলো, আমি সেখান থেকে তোমার জন্য আমার কলিজাটা নিয়ে আসব।'

অতএব জেলিফিস বানরকে নিয়ে আবার দ্বীপে ফিরে গেল। বানর একটা খুব উঁচু গাছে চড়ে সেখান থেকে জেলিফিসকে চেঁচিয়ে বলল, 'আমার প্রাণরক্ষা করার জন্য তোমাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই, কিন্তু আমার কলিজাটা যে কোথায় রেখেছি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, আমি এখানেই থাকব, তুমি তোমার পথে যাও।'

জেলিফিস বুঝতে পারে যে, বানর চালাকি করে তাকে বোকা বানিয়েছে। কিন্তু সে আর কি করবে। সে বিষণ্ন চিত্তে ধীরে ধীরে সাঁতার কাটতে কাটতে সমুদ্রের তলদেশে ড্রাগন রাজার প্রাসাদে গিয়ে তাঁকে সব ঘটনা জানাল। কিন্তু রাজা ভীষণ রেগে যান। দুষ্টু অক্টোপাস বলল, 'মহারাজ, এই জেলিফিসটা কোনো কাজের নয়। আমি আর অন্য সব মাছ মিলে ওকে আচ্ছা করে পিটুনি দিলে ওর উচিত শাস্তি হবে।'

রাজা বললেন, 'ঠিক আছে, পিটুনি দাও ওকে।'

তখনই যেমন কথা তেমন কাজ শুরু হয়ে যায়। বেদম পিটুনির ফলে জেলিফিসের সব হাড় ভেঙে চুরচুর হয়ে যায়। জেলিফিস হুহু করে কাঁদে, সে যতই কাঁদে, অক্টোপাস ততই হো হো করে হাসে।

ঠিক এমন সময় রাজার মেয়ে প্রাসাদের ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসে বলল, 'বাবা, এই দেখো, আমি সম্পূর্ণ ভালো আছি। আমার তেমন কোনো অসুখ হয়নি, শুধু সামান্য একটু পেট-ব্যথা হয়েছিল।'

রাজা বুঝলেন যে, অক্টোপাস তার পুরনো শত্রু জেলিফিসকে একটা শিক্ষা দেবার জন্য মিথ্যা কথা বলেছে। রাজা এত ক্রুদ্ধ হন যে, তিনি অক্টোপাসকে প্রাসাদ থেকে চিরতরে নির্বাসন দেন এবং জেলিফিসকে তার বিশেষ প্রিয়পাত্র রূপে নির্বাচন করেন। এজন্যই অক্টোপাস এখন সমুদ্রের বুকে একা একা ঘুরে বেড়ায়। সমুদ্রের সব প্রাণী তাকে যেমন ভয় করে, তেমন ঘৃণাও করে। আর পূর্বোক্ত ঘটনার কারণেই জেলিফিসের গায়ে কোনো হাড় নেই। হাড় না থাকায় দ্রুত সাঁতার কাটতে না পারলেও সমুদ্রের অন্য প্রাণীরা কেউ তাকে কোনোরকম বিরক্ত করে না।

ভাগ্যবান খড় সাহেব

অনেক অনেক দিন আগে জাপানের এক গাঁয়ে সোবেই নামের এক বিনয়ী, সহৃদয়, ভদ্র যুবক বাস করত। একদিন মাঠে কাজ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে– যে সিঁড়ি রাস্তা থেকে তার গ্রামের দিকে নেমে গেছে সোবেই সেই সিঁড়িতে পা পিছলে পড়ে যায়। গড়াতে গড়াতে সে অনেক নিচে নেমে আসে। শেষ পর্যন্ত সে যখন নিজেকে থামাতে সমর্থ হল, তখন সে দেখল যে, সে একটা শুকনো খড় তার হাতে ধরে আছে।

সোবেই আপনমনে বলল, 'এক টুকরো খড় নিঃসন্দেহে খুবই তুচ্ছ একটা জিনিস, কিন্তু এটা যখন দৈবক্রমে আমার হাতে এসে পড়েছে তখন এটা আমি ফেলে দেব না।'

সোবেই খড়ের দণ্ডটি হাতে নিয়ে হাঁটতে থাকে। কিছুক্ষণ পর একটা ফড়িং কোথা থেকে উড়ে এসে তার মাথার উপর ঘুরতে লাগল। সোবেই খুব বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওহ্, কী যন্ত্রণা! ঠিক আছে, আমি এই ফড়িংটাকে মজা দেখাচ্ছি।' সে ওটাকে ধরে তার লেজ খড়ের দণ্ডটির সঙ্গে বেঁধে দিল।

সোবেই ফড়িং হাতে হেঁটে চলে। একটু পরে এক মহিলা ও তার ছোট্ট ছেলের সঙ্গে তার দেখা হল। বাচ্চা ছেলেটি সোবেই'র হাতে ফড়িং দেখে বায়না ধরল, 'মা, আমি ওই ফড়িংটা নেব। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ।'

সোবেই ছোট্ট ছেলেটির অনুনয় শুনে বলল, 'ঠিক আছে, এই আমি আমার ফড়িং তোমাকে দিয়ে দিলাম।'

ছেলেটি খড়ের দণ্ডে বাঁধা ফড়িং পেয়ে মহাখুশি হয়। তার মা সোবেইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে তিনটি কমলা উপহার দিল।

একটু পরে সোবেই'র দেখা হয় এক ফেরিঅলার সঙ্গে। সে ক্লান্ত হয়ে রাস্তার একপাশে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তাকে দেখে মনে হল সে ভীষণ ক্লান্ত, ভীষণ তৃষ্ণার্ত, এখনই যেন সে জ্ঞান হারিয়ে মূর্ছা যাবে। তার অবস্থা দেখে সোবেই'র খুব চিন্তা হল। এখন কি করবে সে? কাছে-পিঠেকোনো নদী নেই, কোনো ঝরনা নেই। সে তখন তাকে তার কমলা তিনটি দিল। এর রস কিছুটা হলেও তার তৃষ্ণা নিবারণ করবে।

ফেরিঅলা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করে। সে বাজারে বিক্রি করার জন্য তিনটি সুন্দর কাপড় সঙ্গে নিয়ে

যাচ্ছিল। সে তার কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ সোবেইকে তার কাপড় তিনটি দিয়ে দিল। সোবেই ফেরিঅলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাপড় তিনটি হাতে নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে।

কিছুক্ষণ পরে সে অত্যন্ত সুসজ্জিত ঝলমলে একটা গাড়ি দেখতে পায়। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলছে কয়েকজন অনুচর। গাড়িটি ছিল এক রাজকুমারীর। তিনি শহরে যাচ্ছেন কিছু কেনাকাটা করতে। এই সময় গাড়ি থেকে মুখ বাড়াতেই তার চোখে পড়ল সোবেই'র হাতে ধরা অতি সুন্দর তিনটি কাপড়। রাজকুমারী নিজের অজান্তেই উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ওহ্, আমি যদি ওই কাপড় তিনটি পেতাম!'

কথাটা সোবেই'র কানে যায়। সে সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের তিনটি কাপড় রাজকন্যাকে উপহার হিসেবে প্রদান করল। রাজকন্যা খুশি হয়ে তাকে এক বস্তা মুদ্রা দিলেন।

সোবেই ওই টাকা দিয়ে অনেক জমি কিনল। সে ওই জমি তার গ্রামের লোকজনের মধ্যে বণ্টন করে দিল। এখন আর তার গ্রামে ভূমিহীন কেউ নেই। সবাই নিজ নিজ জমি চাষ করে। দেখতে দেখতে গ্রামের সবাই সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে ওঠে। এরপর সবাই যখন শুনল যে, সোবেই'র সৌভাগ্যের মূলে ছিল এক খণ্ড খড় তখন তারা ভীষণ অবাক হয়ে যায়। বিত্তশালী দয়ালু সোবেইকে তারা অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে। আর তারা তার নতুন নামকরণ করল– 'ভাগ্যবান খড় সাহেব।'

ব্যাজার আর মায়াবী পাখা

জাপানে ভূত-পেত্নিদেরবলা হয় টেঙ্গু, ওদের সকলের নাক খুব লম্বা। একদিন ছোট ছোট তিন টেঙ্গু-শিশু বনের ভেতর খেলছিল। তাদের সঙ্গে ছিল একটা মায়াবী পাখা। ওই পাখা দিয়ে ওরা ওদের নাকের এক পাশে হাওয়া করলে ওদের নাক দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যেত, আর অন্য পাশে হাওয়া করলে তা ছোট হতে হতে তাদের স্বাভাবিক আকার গ্রহণ করত।

তিন টেঙ্গু-শিশুতাদের পাখা আর নাক নিয়ে মহানন্দে চমৎকার সময় কাটাতে থাকে। এমন সময় কোথা থেকে একটা ব্যাজার, খুব ছোট আকারের ধূসর বর্ণের জন্তু বিশেষ, ওখানে এসে উপস্থিত হয়। টেঙ্গু-শিশুদেরকাণ্ড দেখে সে ভীষণ অবাক হয়। সে ভাবে, 'ওই রকম একটা পাখা যদি আমি পেতাম, তাহলে কী মজাই হত!' ব্যাজার একটা ফন্দি আঁটে। তো, ব্যাজারেরা নানা রকম কলাকৌশল জানত। তারা ইচ্ছামতো নিজেদের রূপ ও আকার পরিবর্তন করে অন্য রূপ ধারণ করতে পারত। অন্যদের ঠকাতেও তারা ছিল খুব দক্ষ। এখন এই ব্যাজারটি নিজেকে একটা ছোট বালিকাতে রূপান্তরিত করে, হাতে চারটা লোভনীয় মিষ্টি বন-রুটিনিয়ে, টেঙ্গু-শিশুদেরকাছে গেল।

ওদের কাছে গিয়ে সে বলল, 'এই যে লক্ষ্মী বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য চমৎকার বন-রুটিনিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলতে চাই, আমাকে খেলায় নেবে তো?

তিন টেঙ্গু-শিশুমিষ্টি বন-রুটিপেয়ে ভীষণ খুশি হয়। ওটা ছিল তাদের খুব প্রিয় খাবার। কিন্তু ওরা যখন দেখল যে, চারটা রুটি আছে তখন চতুর্থ রুটিটা কে খাবে তা নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। ওদের ঝগড়া আর কিছুতেই থামে না। অবশেষে ব্যাজার বলল, 'শেষ রুটিটা কে খাবে তা স্থির করার একটা খুব ভালো উপায় আছে। শোনো, তোমরা তোমাদের চোখ আর নিশ্বাস বন্ধ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে। যে সবার চাইতে বেশি সময় চোখ না খুলে এবং নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতে পারবে, সে-ইশেষ রুটিটা পাবে।'

তিন টেঙ্গু-শিশুইএই প্রস্তাবে সম্মতি দেয়। ব্যাজার বলল, 'এক! দুই! তিন!' সঙ্গে সঙ্গে টেঙ্গু তিন শিশু তাদের চোখ খুব শক্ত করে বন্ধ করল। আর মুহূর্তের মধ্যে দুষ্টু ব্যাজারটি ওদের পাখাটা হাতে নিয়ে বনের দিকে ছুটে গেল। টেঙ্গু তিন শিশু তখনো শক্ত করে তাদের চোখ আর নিশ্বাস বন্ধ করে নিজ

নিজ জায়গায় পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিল।

ব্যাজার হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, 'আচ্ছা বোকা বানিয়েছি ওই টেঙ্গু বাচ্চাদের!'

কিছুক্ষণ পর ব্যাজারটি একটা মন্দিরে গিয়ে পৌঁছুল। সেখানে সে দামি জামা-কাপড় পরা এক সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেল। তার মনে হল, এই মেয়ে নিশ্চয়ই কোনো রাজকন্যা হবে। প্রকৃতপক্ষেই সে ছিল জাপানের অন্যতম ধনী এক সামন্ত প্রভুর কন্যা। ব্যাজার তখন অত্যন্ত ধূর্ত একটা কাজ করল। সে পা টিপে টিপে ওই মেয়ের পেছনে গিয়ে চোখের পলকে তার হাতের মায়াবী পাখাটা মেয়ের নাকের সামনে সজোরে নাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার নাক দু'হাত লম্বা হয়ে গেল!

কী কাণ্ড! কী কাণ্ড! চারিদিকে প্রচণ্ড হৈচৈ পড়ে যায়। এত সুন্দরী ও ধনী একটি মেয়ে, আর তার কিনা দু'হাত লম্বা একটা নাক! মেয়ের বিত্তশালী পিতা রাজ্যের সব ডাক্তার-কবিরাজকেএনে জড়ো করলেন। কিন্তু কেউ তাঁর মেয়ের নাককে ছোট করার কোনো পথ খুঁজে পেল না। ধনী পিতা প্রচুর অর্থ-সম্পদ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু কোনো ফল হল না। শেষে তিনি বললেন, 'যে আমার মেয়ের নাক ছোট করে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসতে পারবে, তার সঙ্গে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেব, অধিকন্তু তাকে আমি আমার সম্পদের অর্ধাংশ দান করব।'

ব্যাজার এতক্ষণ এই ঘোষণার জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে দ্রুত সামন্তপ্রভুর কাছে গিয়ে বলল যে, সে তাঁর মেয়ের নাক ঠিক করে দিতে পারে। সামন্ত প্রভু তখন তাকে তাঁর মেয়ের শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ব্যাজার তার মায়াবী পাখা বের করে মেয়েটির নাকের অন্য পাশে হাওয়া করল। চোখের পলকে মেয়ের নাক ছোট হয়ে তার স্বাভাবিক আকার ফিরে পেল।

সামন্ত প্রভু খুব খুশি হন, ব্যাজারও খুব খুশি হয়। সে যে বউ হিসেবে একটি অতি সুন্দরী মেয়ে লাভ করবে শুধু তাই নয়, বিপুল ধন-সম্পদওসে লাভ করবে।

বিয়ের দিন তার আনন্দের আর সীমা-পরিসীমাথাকে না। সে প্রচুর খাওয়া-দাওয়াকরে, আর গ্লাসের পর গ্লাস পানীয় পান করে। অল্পক্ষণের মধ্যে তার ঘুম পায় আর তার খুব গরম লাগতে শুরু করে। সে একটা নরম বালিশের উপর মাথা রেখে, কোনো রকম ভাবনা-চিন্তা না করে তার হাতের মায়াবী পাখা দিয়ে সজোরে নিজেকে বাতাস করতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে তার নাকও লম্বা হতে শুরু করে, কিন্তু ব্যাজার তখন প্রায় আধা-ঘুমন্ত,কী ঘটছে তা সে বুঝতে পারে না। সে বাতাস করতে থাকে তার নাকও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলে। এক সময় তার নাক ঘরের ছাদ ভেদ করে আকাশের দিকে উঠে গিয়ে মেঘমালাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

ওদিকে মেঘমালার ওপারে কতিপয় স্বর্গীয় শ্রমিক আকাশগঙ্গার উপর দিয়ে একটা সেতু নির্মাণ করছিল। হঠাৎ ব্যাজারের সুদীর্ঘ নাকটি তাদের চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আমাদের সেতুর জন্য একটা লম্বা দণ্ড খুঁজছিলাম। এটা মনে হয় একেবারে ঠিক মাপের হবে। এসো, ওটাকে টেনে উপরে তোলা যাক।'

তারা ব্যাজারের নাক টানতে শুরু করে। নাকের উপর সজোরে টান অনুভব করে ব্যাজার ভীষণ অবাক হয়ে যায়। সে চিৎকার করে ওঠে, 'উঃ! ভীষণ লাগছে, বাঁচাও, বাঁচাও!'

তারপরই সে তার পাখা দিয়ে দ্রুত তার নাকের অন্য পাশে হাওয়া করতে শুরু করে। কিন্তু ততক্ষণে বড় বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিল। স্বর্গের শ্রমিকেরা তার নাক টানতে থাকে– 'হেঁইও, মারো হেঁইও! টানো জোরো হেঁইও!' শেষ পর্যন্ত তারা ব্যাজারকে সুদ্ধ আকাশে টেনে তোলে। অতঃপর ব্যাজারকে আর কোথাও দেখা যায়নি।

বাঁদর নাচ আর চড়ুই নাচ

বহুকাল আগের কথা। এক বৃদ্ধ কাঠুরে একদিন জ্বালানির জন্য কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশে পাহাড়ের জঙ্গলে যায়। সে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে যায়। কোথায় যাচ্ছে, কোনদিকে যাচ্ছে, তার কিছুই খেয়াল থাকে না। হঠাৎ তার কানে এসে বাজে গান-বাজনারধ্বনি, তার নাকে এসে লাগে সুন্দর খাবার-দাবার আর সুমিষ্ট পানীয়ের গন্ধ।

বৃদ্ধ কাঠুরে একটা টিলার উপর চড়ে দেখল যে, অল্প একটু দূরে মহানন্দে অনেকগুলি বানর খাওয়া-দাওয়া করছে, সুরা পান করছে আর নাচছে। সুরার গন্ধে বুড়োর মন আনচান করে ওঠে। সে মনে মনে বলল, 'ওই সুরা আমার পান করতেই হবে।'

বানরগুলি এত চমৎকার তাল-লয়রেখে নাচে যে, বৃদ্ধ কাঠুরে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর একটা বানর তার লাউয়ের খোলের মধ্যে সুরা ঢেলে তা পূর্ণ করে তার সঙ্গীদের বলল, 'অনেক রাত হয়েছে, ভাইরা আমার, এবার আমাকে বাড়ি যেতে হবে।'

সবাই তাকে বিদায় জানায়। কাঠুরে ঠিক করল– সে ওই বানরের পেছনে পেছনে যাবে, ওর কাছ থেকে কিছু সুরা পাওয়ার চেষ্টা করবে।

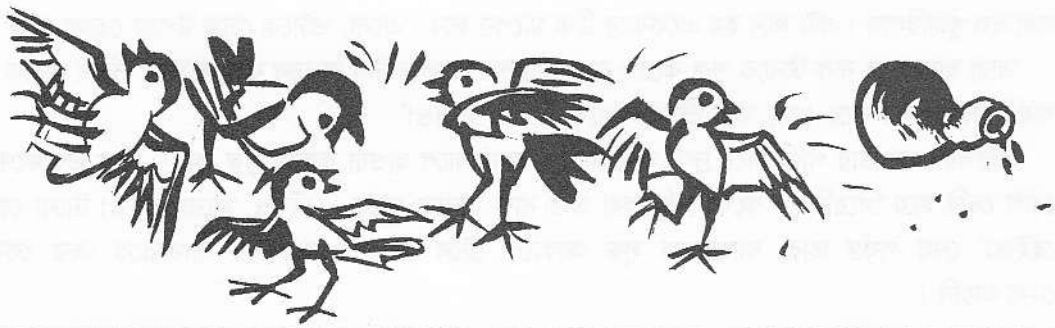

কিছুক্ষণ যাবার পর বানরটির কাছে তার সুরাভর্তি বিশাল লাউয়ের খোলকে খুব ভারী মনে হল। সে খানিকটা সুরা আরেকটা ছোট পাত্রে ঢেলে নিয়ে লাউয়ের বড় খোলটি একটা প্রাচীন বৃক্ষের ফাঁপা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। তারপর সে তার ছোট পাত্রটি নিজের মাথার উপর বসিয়ে চমৎকার ভারসাম্য বজায় রেখে নাচের ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল।

বুড়ো কাঠুরে এতক্ষণ একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সব কিছু দেখছিল। বানর চোখের আড়ালে চলে যেতেই বুড়ো মনে মনে বলল, 'আমি যদি ওর সুরা থেকে সামান্য একটু ধার নিই, তাহলে ও নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না।'

বুড়ো কাঠুরে প্রাচীন গাছের ফাঁপা গর্ত থেকে বড় লাউয়ের খোলটি বের করে সেখান থেকে খানিকটা সুরা তার নিজের খোলে ঢেলে নিতে নিতে বলল, 'এর গন্ধ যেমন প্রাণমাতানো, স্বাদও যদি তেমন হয় তাহলে তো আর কথাই নেই!' সে খুশি মনে চলতে থাকে আর ঠিক করে যে, তার বউকেও সে এই সুরার খানিকটা পান করতে দেবে। কিন্তু তার আগে তো তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। সে যে পথ হারিয়ে ফেলেছে!

এদিকে বুড়িরও চমৎকার এক অভিজ্ঞতা হয়। সে একটা গাছের নিচে বসে কাপড় ধুচ্ছিল, হঠাৎ সে দেখল যে, গাছের উপর অনেকগুলি চড়ুই বসে মহানন্দে গল্প করছে, খাচ্ছে আর সুরা পান করছে। সুরার গন্ধ বুড়ির নাকে এত মধুর লাগে যে, সে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করল যে ওই সুরা তাকে চেখে দেখতেই হবে।

অতএব চড়ুইদের পার্টি শেষ হবার পর বুড়ি ওদের একটা সুরার খোল দ্রুত তার কাপড়ের নিচে লুকিয়ে ফেলল আর মনে মনে বলল, 'এর গন্ধ যেমন মন-মাতানো,স্বাদও যদি তেমন হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। আমি আমার স্বামীকে এটা পান করতে দেব।'

ওদিকে বৃদ্ধ কাঠুরে শেষ পর্যন্ত তার বাড়ির পথ খুঁজে পায়। বুড়ো-বুড়িপ্রায় একই সময়ে নিজেদের বাড়ি এসে পৌঁছে এবং প্রায় একই সঙ্গে পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'তোমার জন্য চমৎকার একটা জিনিস এনেছি আমি।' তারা একে অন্যকে তাদের অপূর্ব অভিজ্ঞতার কথা বলল এবং পরস্পর সুরার পাত্র অদল-বদলকরে বড় বড় চুমুক দিয়ে তা থেকে পান করল।

তাদের কাছে ওই সুরার স্বাদ মনে হল যেন স্বর্গীয়। পান শেষে একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে। বুড়ো-বুড়ির দু'জনের মধ্যেই নাচবার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। বুড়ি বানরের মতো কিচমিচ করে লাফাতে শুরু করে আর বুড়ো কাঠুরে তার দু'হাত সামনের দিকে প্রসারিত করে একটা চড়ুই পাখির মতো কিচির-মিচির করে।

প্রথমে বৃদ্ধ কাঠুরে গান ধরল–

'মধুর মধুর বসন্ত, কী আনন্দের দিন,
এক শ' চড়ুই নাচে ধিন তা ধিন ধিন।'

এরপরই গান ধরল বুড়ি–

'এক শ' বানরের সে কী কিচির-মিচির,
ওহো, সে কী মধুর কিচিরি-মিচির!'

বুড়ো-বুড়িএত হৈ চৈ করতে শুরু করে যে, কী ব্যাপার দেখার জন্য বাড়িঅলা ছুটে চলে আছে। সে ওদের দু'জনের কাণ্ড দেখে তাজ্জব বনে যায়। সে দেখে যে, বুড়ি একটা বানরের মতো লাফালাফি করছে, আর বুড়ো একটা চড়ুই পাখির মতো তিড়িং-বিড়িংকরে নাচছে।

বাড়িঅলা চেঁচিয়ে বলল, 'এসব কী হচ্ছে! না না, এসব চলবে না। মেয়েলোকের নাচ হবে সুন্দর-

শোভন-শালীন,চড়ুই পাখির মতো। আর পুরুষ মানুষের নাচ হবে লম্ফ-ঝম্পপূর্ণ, বানরের লাফালাফির মতো। তোমরা তো উল্টোটা করছ।'

অবশেষে বুড়ো-বুড়িতাদের নাচ শেষ করে বাড়িঅলাকে তাদের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার গল্প বলল। বাড়িঅলা ওদের সব কথা শুনে বলল, 'আমি এখন বুঝতে পারছি কী ঘটেছে। তোমরা ভুল সুরা পান করেছ। তোমাদের সুরার পাত্র দু'টি বদলে নিয়ে পান করে দেখো না কি হয়!'

এরপর বৃদ্ধ কাঠুরে পান করল বানরের সুরা, আর বুড়ি চড়ুইয়ের সুরা। আর এবার যখন তারা নাচ শুরু করল তখন বুড়োর নাচে দেখা গেল পুরুষালি লাফ-ঝাঁপ আর বুড়ির নাচে সুন্দর শালীনতা। চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে এসে তাদের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় এবং তারাও ওদের মতো করে নাচতে শুরু করে। আর তাই আমরা আজও পুরুষদের নাচের মধ্যে দেখি পুরুষালি লম্ফ-ঝম্প, আর মেয়েদের নাচের মধ্যে স্নিগ্ধ-কোমলঅঙ্গভঙ্গি।

মায়াবী চায়ের কেৎলি

অনেক দিন আগের কথা। এক বৃদ্ধ পুরোহিত ছিলেন, যিনি চা পান করতে খুব ভালোবাসতেন। নিজের চা তিনি সর্বদা নিজে বানাতেন এবং চায়ের পেয়ালা-চামচ-কেৎলিত্যাদির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতিশয় খুঁতখুঁতে। একদিন তিনি একটা পুরনো জিনিসপত্র বেচাকেনার দোকানে একটি ভারি সুন্দর লোহার কেৎলি দেখতে পেলেন। চায়ের জল গরম করার জন্য ওই কেৎলি ছিল খুবই উপযুক্ত। তবে কেৎলিটা ছিল অত্যন্ত পুরনো এবং মরচে পড়া। পুরনো এই কেৎলির আসল সৌন্দর্য কিন্তু বৃদ্ধ পুরোহিতের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বেশ কমদামে কেৎলিটি কিনে সেটা তার মন্দিরে নিয়ে এলেন। তিনি সযত্নে ঘষেমেজে কেৎলিটা উজ্জ্বল ঝকঝকে করে তুললেন, তারপর তার দুই শিষ্যকে কাছে ডেকে আনলেন। ওরা পুরোহিতের সঙ্গে ওই মন্দিরেই বাস করত।

পুরোহিত শিষ্যদের লক্ষ করে বললেন, 'দেখো, আজ আমি কী সুন্দর একটা কেৎলি কিনে এনেছি। এখন আমি এই কেৎলিতে ভালো করে জল ফুটিয়ে চমৎকার চা বানাব, তারপর তিনজনে মিলে ওই চা খাব।'

পুরোহিত একটা কাঠকয়লার উনুনের উপর কেৎলি বসিয়ে দিলেন। ওরা সবাই গোল হয়ে বসে জল ফুটবার জন্য অপেক্ষা করে। কেৎলি ক্রমান্বয়ে গরম থেকে অধিকতর গরম হয়ে উঠতে থাকে, তারপর হঠাৎ

একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। কেৎলির মুখ দিয়ে একটা ব্যাজারের মাথা বেরিয়ে আসে। ব্যাজার হল ক্ষুদ্র ধূসর বর্ণের গর্তবাসী একটি জন্তু বিশেষ। কেৎলির মুখে শুধু ব্যাজারের মাথায় নয়, সেখানে দেখা গেল ব্যাজারের চারটি ছোট হাত-পাএবং একটা ছোট ঝাঁকড়া লেজ।

কেৎলির চিৎকার শোনা গেল 'উহ! কী গরম। আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে!' তারপরই কেৎলিটা লাফ দিয়ে উনুন থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাজার তার পা নিয়ে ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগল।

বৃদ্ধ পুরোহিত খুব অবাক হয়ে যান! কিন্তু তিনি তার সাধের কেৎলি হারাতে রাজি নন। তিনি তার দুই শিষ্যকে লক্ষ করে বললেন, 'এই, তোমরা তাড়াতাড়ি ওটাকে পাকড়াও করো। সাবধান, ওটা যেন কিছুতেই পালিয়ে যেতে না পারে।'

এক শিষ্য একটা ঝাঁটা হাতে তুলে নেয়, আরেকজন আগুন থেকে কয়লা তোলার একটা চিমটা। তারপর ওরা দু'জন কেৎলির পেছন পেছন ছুটল। তারপর ওরা দু'জন ওটাকে যখন পাকড়াও করতে সক্ষম হল তখন দেখা গেল ব্যাজারের মাথা, তার ঝাঁকড়া লেজ, তার ছোট ছোট দু'টি পা আর দু'টি হাত অদৃশ্য হয়ে গেছে। জিনিসটা আবার একটা সাধারণ কেৎলিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

বৃদ্ধ পুরোহিত বললেন, 'এ তো ভারি অদ্ভুর ব্যাপার! এটা নিশ্চয়ই কোনো মায়াবী চায়ের কেৎলি হবে! তো, আমরা আমাদের মন্দিরে এরকম কোনো জিনিস রাখতে চাই না। এটাকে বিদায় করতে হবে।'

ঠিক ওই সময়ে পুরনো জিনিসপত্রের বেচাকেনা করা এক ব্যবসায়ী মন্দিরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বৃদ্ধ পুরোহিত কেৎলিটা তার কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'দেখো, আমি আমার এই কেৎলিটা বিক্রি করতে চাই। আমি কোনো দরদস্তুর করব না। তুমি খুশি হয়ে যে দাম দেবে আমি সেই দামেই তোমার কাছে এটা বেচে দেব।'

ব্যবসায়ী তার দাঁড়িপাল্লা বের করে কেৎলিটা ওজন করল, তারপর নিতান্ত স্বল্পমূল্যে সে ওই কেৎলি বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছ থেকে কিনে নিল। সে খুশিমনে শিস দিতে দিতে নিজের বাড়ির পথ ধরল।

সেদিন রাতে ব্যবসায়ী এবং তার বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে, তখন একটা বিচিত্র কণ্ঠস্বর শুনে ব্যবসায়ী-গৃহকর্তারঘুম ভেঙে যায়। সে শুনতে পায় কে যেন তাকে ডাকছে– 'ও ভাই, শুনুন! শুনুন!'

সে চোখ খুলে দেখতে পায় যে, তার বালিশের পাশে একটা কেৎলি দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথা, হাত-পা ও লেজ একটা ব্যাজারের। ব্যবসায়ী বলল, 'আরে! গতকাল বুড়ো পুরোহিতের কাছ থেকে আমি যে পুরনো কেৎলিটা কিনেছিলাম তুমি সেটা না?'

কেৎলি বলল, 'হ্যাঁ স্যার, আমি সেটাই, তবে আমি সাধারণ কেৎলি নই। আমি আসলে একটা ব্যাজার, ছদ্মবেশ ধরে আছি। আমার নাম বুমবুকু, যার অর্থ সৌভাগ্য। বৃদ্ধ পুরোহিত আমাকে উনুনে চাপিয়ে আমার সর্বাঙ্গ প্রায় পুড়িয়ে দেয়, তাই আমি ওর ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি। আপনি যদি আমার সঙ্গে সহৃদয় আচরণ করেন, আমাকে ভালো করে খাওয়ান-দাওয়ান, আমাকে কখনো উনুনের উপর না বসান, তাহলে আমি আপনার কাছে থাকব, আপনাকে সাহায্য করব, আপনাকে একজন খুব ধনী মানুষ বানিয়ে দেব।'

ব্যবসায়ী বলল, 'এ তো বড় আশ্চর্য কথা! তো, তুমি কীভাবে আমাকে ধনী মানুষ বানাবে?'

কেৎলি তার ঝাঁকড়া ব্যাজার-পুচ্ছদোলাতে দোলাতে বলল, 'আমি নানা রকম খেলা দেখাতে পারি। আপনি একটা ক্রীড়া প্রদর্শনীর আয়োজন করুন, ঘোষণা দিন যে, দর্শকবৃন্দ অত্যাশ্চর্য কিছু খেলা দেখবেন,

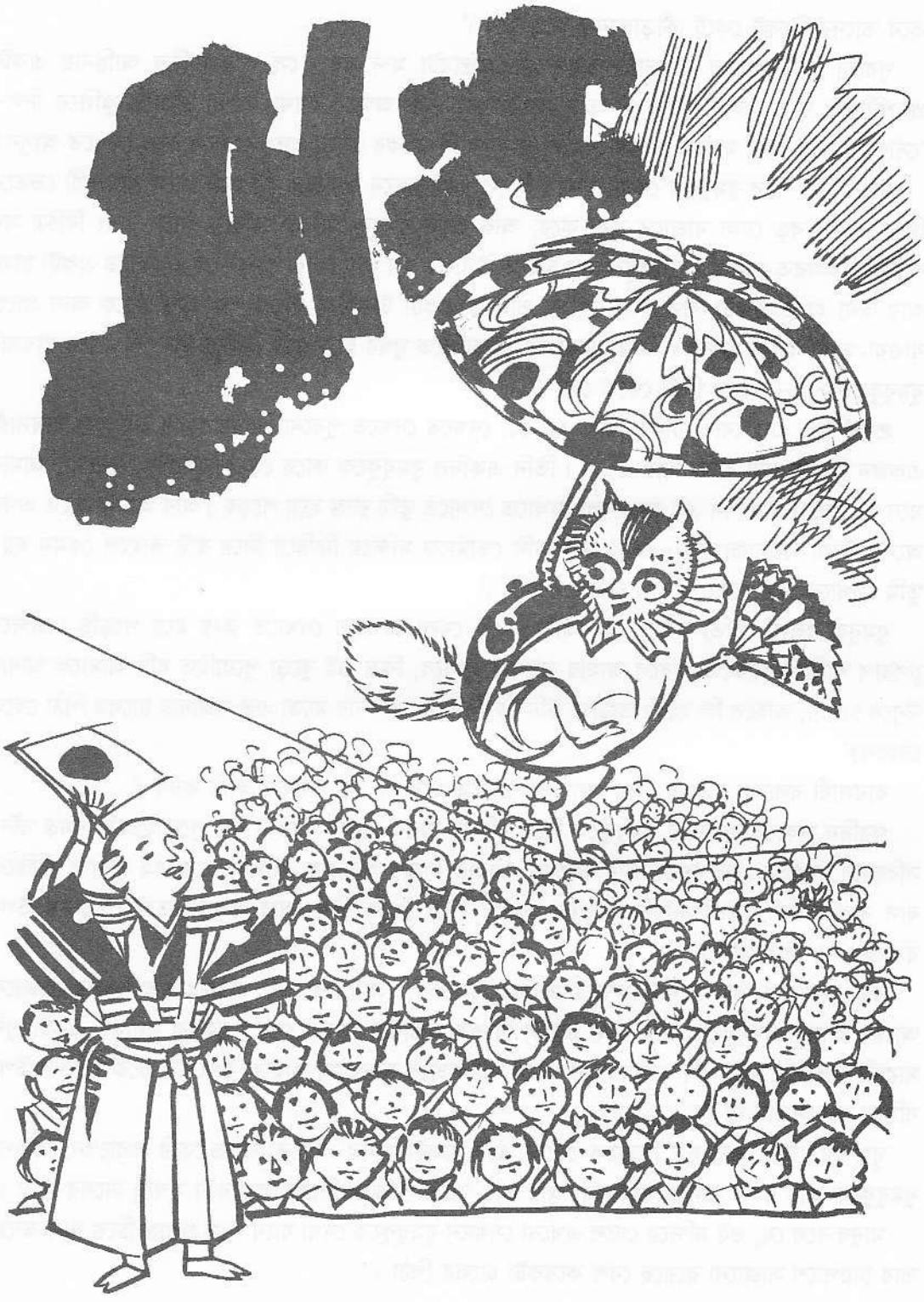

তবে তাদের টিকেট কেটে ক্রীড়াঙ্গনে ঢুকতে হবে।'

পুরনো জিনিসপত্রের ব্যবসায়ী ভাবল যে, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সে তার বাড়ির আঙিনায় একটা প্রদর্শনীস্থল গড়ে তুলল। তারপর তার সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা একটা বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দিল– 'সৌভাগ্য বয়ে আনা মায়াবী চায়ের কেৎলি বুমবুকুর বিস্ময়কর ক্রীড়া প্রদর্শন! দলে দলে দেখতে আসুন!'

মানুষ ভিড় করে বুমবুকুর খেলা দেখতে আসে। ক্রীড়াঙ্গনে জনতায় পূর্ণ হয়ে গেলে ব্যবসায়ী ভেতরে গিয়ে একটা বড় ঢোল বাজাতে শুরু করে, আর তখন বুমবুকু দৌড়ে বেরিয়ে আসে এবং বিচিত্র সব শারীরিক কসরত দেখায়। দর্শকবৃন্দ সব চাইতে উল্লসিত হয় যখন তারা বুমবুকুকে একহাতে একটা ছাতা আর অন্য হাতে একটা পাখা নিয়ে নাচের ভঙ্গিতে একটা টান টান দড়ির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া-আসা করতে দেখে। সমস্ত ক্রীড়াঙ্গন করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে। ক্রীড়া প্রদর্শনী শেষে ব্যবসায়ী বুমবুকুকে সুস্বাদু চালের পিঠা খেতে দেয়।

প্রদর্শনীতে এত বেশি টিকিট বিক্রি হয় যে, দেখতে দেখতে পুরনো জিনিসপত্রের ওই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী একজন বিশাল ধনী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তিনি একদিন বুমবুকুকে কাছে ডেকে বললেন, 'দেখো, আমার মনে হয় দিনের পর দিন এই সব খেলা দেখাতে দেখাতে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আর আমার হাতে এখন অনেক টাকা-পয়সাজমেছে। এখন আমি যদি তোমাকে মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই তাহলে কেমন হয়? তুমি সেখানে বেশ শান্তিতে বাস করতে পারবে।'

বুমবুকু বলল, 'সত্যি বলতে কি, আমিও এই খেলা দেখাতে দেখাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মন্দিরে চুপচাপ শান্তিতে থাকতে পারলে আমার ভালোই লাগবে, কিন্তু ওই বুড়ো পুরোহিত যদি আমাকে আবার উনুনে চাপায়, তাহলে কি হবে? তাছাড়া উনি কি আমাকে আপনার মতো এত মজাদার চালের পিঠা খেতে দেবেন?'

ব্যবসায়ী বললেন, 'এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। যা করবার আমি করব।'

পরদিন সকালে ব্যবসায়ী বুমবুকুকে নিয়ে মন্দিরে ফিরে গেলেন। তিনি বৃদ্ধ পুরোহিতকে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বললেন। সব শেষে তিনি বললেন, 'এবার আমার অনুরোধ, আপনি ওকে এই মন্দিরে শান্তিতে বাস করতে দিন, তাকে নিয়মিত সুস্বাদু চালের পিঠা খেতে দিন, আর কখনো তাকে উনুনের উপর বসাবেন না, ঠিক আছে?'

বৃদ্ধ পুরোহিত তার সানন্দ সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'আমাদের এই মন্দিরে যত ধনরত্ন সাজানো আছে– আমরা বুমবুকুকে তার মধ্যে একটা বিশেষ সম্মানীয় আসন দেব। বুমবুকু যথার্থই একটা গুণী মায়াবী কেৎলি। আমি যদি ওর সম্পর্কে আগে সঠিকভাবে জানতাম, তাহলে কখনোই ওকে উনুনের উপর বসিয়ে কষ্ট দিতাম না।'

বৃদ্ধ পুরোহিত তার দুই শিষ্যকে ডেকে এনে একটা সুন্দর কাঠের স্ট্যান্ড তৈরি করালেন, তারপর বুমবুকুকে তার উপর সাদরে বসালেন, আর তার পাশে সাজিয়ে দিলেন কয়েকটা সুস্বাদু চালের পিঠা।

মানুষ বলে যে, ওই মন্দিরে গেলে এখনো সেখানে বুমবুকুকে দেখা যাবে। সে প্রশান্ত চিত্তে বসে আছে, তার চারপাশে সাজানো রয়েছে বেশ কয়েকটা চালের পিঠা।

লেজকাটা বানর

একদা এক বানর ছিল। সে ছিল অল্পবয়সী এবং মহা বোকা। সারাক্ষণ নানা দুষ্টুমি করত, অনেক রকম বোকামি করত, মাঝে মাঝে বেশ বিপজ্জনক কাজও করত। অন্য বানরেরা তাকে সাবধান করে দেয়, নিজেকে না শোধরালে সে একদিন খুব বিপদে পড়ে যাবে। কিন্তু সে ওদের কথায় কান দেয় না।

একদিন সে বনের মধ্য দিয়ে ছুটতে থাকে, বিরাট উঁচু গাছগুলোতে ওঠে, লম্বা লতা ধরে ঝুলতে ঝুলতে একগাছ থেকে আরেক গাছে লাফ দিয়ে চলে যায় এবং একবার অসাবধানতাবশত সে মাঝপথে ঝুপ করে নিচে পড়ে যায়। পড়বি তো পড়, বানরটি গিয়ে পড়ে একটা কাঁটা ঝোপের উপর। আর একটা তীক্ষ্ণ লম্বা কাঁটা তার লেজের প্রান্তদেশকে একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড়করে দেয়।

বানরটা তার লেজ দু'হাতে ধরে 'ওহ্, ওহ্' বলে ব্যথায় চিৎকার করতে থাকে। বোঝা যায় যে, ওই বোকা বানর মোটেই কষ্টসহিষ্ণু নয়, সাহসীও নয়।

ঠিক ওই সময় একজন নাপিত ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। তার হাতে ছিল তার ক্ষুর। বানরটি তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'নাপিত-ভাই,দয়া করে তোমার ক্ষুর দিয়ে আমার লেজ থেকে এই কাঁটাটা সরাবার একটা ব্যবস্থা করো। ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি আমি।'

তার অনুরোধে নাপিত নিজের ক্ষুর হাতে নিয়ে বানরের লেজের কাঁটা সরাবার উদ্যোগ নেয়, কিন্তু বোকা ও ভীতু বানরটা তার লেজের দিকে ক্ষুরটাকে এগিয়ে আসতে দেখেই 'ওরে বাবা, ভীষণ লাগবে যে!' বলেই একটা বিরাট লাফ দেয়, আর এর ফলে তার লেজের প্রান্তদেশ ক্ষুরের আঘাতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

বানর তার লেজের অবস্থা দেখে ভীষণ রেগে যায়। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে নাপিতকে উদ্দেশ করে বলল, 'দ্যাখো, তুমি কী করেছ! এখনই আমার কাটা লেজ আবার ঠিক জায়গায় জুড়ে দাও, না পারলে আমাকে তোমার ক্ষুরটা দিয়ে যেতে হবে।'

তো, কাটা লেজ তো আর জোড়া দেয়া সম্ভব নয়, তাই নাপিতকে শেষ পর্যন্ত বানরকে তার ক্ষুরটাই দিতে হয়। বোকা বানর ওই ক্ষুর নিয়ে তার কাটা লেজসহ লাফাতে লাফাতে বনের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলে। তাকে খুব অদ্ভুত দেখায়, কিন্তু ক্ষুর পেয়ে সে খুব গর্ব বোধ করে। কাটা লেজের কথা তার মনেই পড়ে না।

একটু পরেই বানরের দেখা হয় এক বুড়ির সঙ্গে। বুড়ি তার উনুনের জন্য জঙ্গল থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করছিল। বুড়ি গাছের শুকনো মরা শাখা ভেঙে ছোট ছোট করে তা বস্তায় ভর্তি করছিল। বানর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বুড়ির কাজ লক্ষ করে। অনেকক্ষণ ধরেই সে ভাবছিল, তার এই চমৎকার ক্ষুরটা কাকে দেখানো যায়। এবার একটা সুযোগ এসেছে। সে বুড়ির কাছে গিয়ে বলল, 'দ্যাখো দিদি ভাই, কী সুন্দর আমার এই ক্ষুর, আর ভীষণ ধারালো। তুমি ইচ্ছে করলে তোমার জ্বালানি কাঠ কাঠার জন্য এটা আমার কাছ থেকে ধার নিতে পারো।'

বুড়ি খুব খুশি হয়। সে বানরকে উদ্দেশ করে বলল, 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, বানর দাদু।' তারপর সে বানরের ক্ষুর দিয়ে কাঠ কাটতে শুরু করল।

কিন্তু ক্ষুর দিয়ে কি আর কাঠ কাটা যায়? কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্ষুরের গায়ে নানা দাগ ও আঁচড় পড়ে যায়, ক্ষুরটার ধার নষ্ট হয়ে সেটা ভোঁতা হয়ে পড়ে।

তার ক্ষুরের এই অবস্থা দেখে বানর ভীষণ রেগে গিয়ে বুড়িকে উদ্দেশ করে বলল, 'দ্যাখো, আমি তোমাকে আমার ক্ষুর যে অবস্থায় দিয়েছিলাম ঠিক সেই অবস্থায় আমাকে ফেরত দিতে হবে, না পারলে আমাকে তোমার জ্বালানি কাঠগুলো দিতে হবে।'

তো, বুড়ির পক্ষে তো আর বানরের ক্ষুরকে তার আগের অবস্থায় ফেরানো সম্ভব নয়, তাই সে তার জ্বালানি কাঠের কিছু অংশ বানরকে দিয়ে দেয়। বোকা বানর তখন ওই জ্বালানি কাঠ পিঠে নিয়ে বনের মধ্য দিয়ে ছুটে চলে। কাটা লেজ নিয়ে তাকে খুব অদ্ভুত দেখায়, কিন্তু তার পিঠের জ্বালানি কাঠের বোঝার জন্য বোকা বানর এত গর্ব বোধ করে যে, তার লেজের কথা আর মনেই পড়ে না।

কিছুক্ষণ পর বানরটি দেখল যে, রাস্তার পাশে এক রুটিওয়ালি বিস্কুট বানাচ্ছে। তখন বিস্কুট ছিল বানরের খুব প্রিয় খাবার। বিস্কুট খাবার জন্য তার প্রাণ আনচান করে ওঠে। সে রুটিওয়ালির কাছে গিয়ে বলল, 'দ্যাখো খালা, আমার কাছে খুব চমৎকার শুকনো জ্বালানি কাঠ আছে, এটা দিয়ে খুব ভালো আগুন হবে এবং তোমার বিস্কুট তৈরির কাজ খুব সুন্দর হবে এবং খুব দ্রুতও হবে। তোমার বিস্কুট ভাজার জন্য তুমি আমার কাছ থেকে কিছু জ্বালানি কাঠ ধার নিতে পারো।'

তখন রুটিওয়ালির নিজের কাঠ ছিল কাঁচা, তাতে মোটেই ভালো আগুন জ্বলছিল না। সে বানরের শুকনো কাঠ দিয়ে উনুন ধরাতেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে।

বানর এক পাশে দাঁড়িয়ে বিস্কুট তাজা হতে দেখে। তার নাকে এসে লাগে ভাজা বিস্কুটের চমৎকার গন্ধ। তার জিভে জল এসে যায়।

কিন্তু শুকনো কাঠ তো খুব তাড়াতাড়ি জ্বলে। দেখতে দেখতে সব কাঠ জ্বলে ছাই হয়ে যায়। বানর তার কাঠের এই অবস্থা দেখে ভীষণ রেগে গিয়ে রুটিওয়ালিকে বলল, 'দ্যাখো, তুমি আমার কাঠের কী অবস্থা করেছ! এখন তুমি আমার কাঠ যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থায় ফেরত দাও, আর তা না পারলে তুমি যে

বিস্কুট বানিয়েছ তা আমাকে দিয়ে দাও।'

রুটিওয়ালি বলল, 'আমি তোমাকে তোমার কাঠ কীভাবে ফেরত দেব? তুমি তো তোমার চোখের সামনে ওই কাঠ পুড়ে ছাই হয়ে যেতে দেখলে।'

বানর বলল, 'আমি সে সব জানি না। তুমি হয় আমার কাঠ ফেরত দেবে, নয় তো তোমার বিস্কুটগুলি দেবে।'

ছাইকে তো জ্বালানি কাঠে রূপান্তরিত করা যায় না। রুটিওয়ালি আর কী করে? সে সদ্য ভাজা বাদামি রঙের মুচমুচে বিস্কুটগুলি বানরের হাতে তুলে দেয়। আর সুস্বাদু বিস্কুটগুলি খেতে খেতে মহানন্দে বানর আবার বনের ভেতর দিয়ে ছুটে চলে। তার কাঁটা লেজের কথা সে ভুলেই যায়।

চলতে চলতে বানরের দেখা হয় এক বৃদ্ধের সঙ্গে। বৃদ্ধ তামার তৈরি একটি অতি সুন্দর ঘণ্টা হাতে নিয়ে তার লাঠি ঠুকতে ঠুকতে কোথায় যেন যাচ্ছে। বানর মনে মনে বলল, 'আমার ওই ঘণ্টাটা চাই। আমি ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাব, তখন সবাই আমার কথা শোনার জন্য আমার কাছে ছুটে আসবে। খুব মজা হবে তখন।' বানরের কাছে তখনো কয়েকটা বিস্কুট অবশিষ্ট ছিল। সে ঠিক করল যে, বুড়ো রাজি হলে সে ওই বিস্কুটগুলির বিনিময়ে বুড়োর ঘণ্টাটা সংগ্রহ করবে।

বানর বুড়োর কাছে গিয়ে বলল, 'দাদুভাই, আমার কাছে খুব সুস্বাদু কয়েকটা বিস্কুট আছে। তুমি যদি আমাকে তোমার ওই পুরনো ঘণ্টাটা দাও তাহলে আমি তোমাকে আমার বিস্কুটগুলি দেব।' সে চেখে দেখার জন্য বুড়োর হাতে একটা বিস্কুট দিল।

বিস্কুট খেয়ে বুড়ো তো মহাখুশি। এত সুস্বাদু বিস্কুট সে আগে কখনো খায়নি। সে বলল, 'ঠিক আছে, এই নাও আমার ঘণ্টা, আর আমাকে দাও তোমার বিস্কুটগুলি।'

খুব দ্রুত বিস্কুট আর ঘণ্টার হাত বদল হয়ে যায়। বোকা বানর ঘণ্টা হাতে নিয়ে খুব উঁচু একটা গাছে উঠে যায়। গাছটি ছিল জীর্ণ ও দুর্বল। লেজহীন বানরকে খুব অদ্ভুত দেখায় কিন্তু তার ঘণ্টার জন্য গর্বে

পূর্ণ হয়ে বোকা বানরের লেজের কথা মনেই হয় না।

বানরটি তার ঘণ্টা সজোরে বাজাতে বাজাতে উচ্চকণ্ঠে গান ধরল–

অতি সুদর্শন এক বানর আমি
আমার মতো চালাক বানর বিশ্বে আর নাই
আমার এই ঘণ্টা আমি সারাক্ষণ বাজাই
কী আনন্দ কী আনন্দ, তাই তাই তাই।
আমার ছিল ভারি সুন্দর এক লেজ
তার বদলে নিলাম আমি ধারালো এক ক্ষুর
ক্ষুরের বদলে নিলাম আমি জ্বালানি কাঠের স্তূপ
জ্বালানি কাঠের বদলে নিলাম আমি
কয়েকটা বিস্কুট
বিস্কুটের বদলে নিলাম আমি একটা ঘণ্টা!
ওহো কী সুন্দর কী সুন্দর এই ঘণ্টা
খুশিতে ভরে আছে আমার সারা মনটা।
ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং।

লেজবিহীন বোকা বানরকে ভারি অদ্ভুত দেখায়। তার চেঁচামেচি, উচ্চকণ্ঠের গান আর বিশাল ঘণ্টার আওয়াজে চারপাশের সব বানর এসে তার গাছের নিচে জড়ো হয়। লেজবিহীন বোকা বানরকে যে কী রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে তা সে বুঝতেই পারে না। আর এক সময় সে তার ঘণ্টায় এত জোরে আঘাত করে যে, তাল সামলাতে না পেয়ে সে হুড়মুড় করে ওই উঁচু গাছ থেকে নিচে পড়ে যায়। আব পড়বি তো পড়, সে গিয়ে পড়ল আবার আরেকটা কাঁটাঝোপের উপর!

অন্য বানরগুলি তার দুরবস্থা দেখে হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর সবাই মিলে তার গা থেকে কাঁটাগুলি একটা একটা করে তুলতে শুরু করে। এরপর থেকেই সবাই ওকে ডাকতে থাকে– 'লেজকাটা ঢং ঢং বানর।'

পীচ বালক

অনেক কাল আগের কথা। জাপানে এক বৃদ্ধ দম্পতি বাস করত। বুড়ো-বুড়িরকোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। সন্তান না থাকায় তারা প্রায়ই খুব বিষণ্ন হয়ে থাকত। নিজেদের তাদের খুব নিঃসঙ্গ মনে হত।

বুড়ো ছিল এক কাঠুরে। সে একদিন জ্বালানি কাঠ কাটার জন্য পাহাড়ি জঙ্গলে যায়, আর বুড়ি যায় নদীর পাড়ে ময়লা জামা-কাপড়ধোয়ার জন্য।

বুড়ি জামাকাপড় সবে ধুতে শুরু করেছে, এমন সময় সে হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল যে, একটা মস্তবড় পীচ ফল নদীর জলে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যাচ্ছে। এত বড় পীচ সে তার জীবনে দেখেনি। সে তাড়াতাড়ি পীচটা জল থেকে তুলে মনে মনে বলল, 'এটা আমি বাড়ি নিয়ে যাব, আমার স্বামী আর আমি দু'জনে মিলে একসঙ্গে এই পীচ খাব।'

বিকালের দিকে বৃদ্ধ কাঠুরে বাড়ি ফিরলে বুড়ি তাকে পীচটা দেখিয়ে বলল, 'দ্যাখো, কত বড় একটা পীচ পেয়েছি আমি। আজ রাতে এটা দিয়েই আমাদের খাওয়া হয়ে যাবে।' কাঠুরে দেখল যে সত্যিই ফলটা বিশাল আকারের। সে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। এটা দিয়ে আমাদের দু'জনেরই আজ রাতের খাবার হয়ে যাবে।'

বুড়ো রান্নাঘর থেকে একটা বড় ছুরি এনে পীচটা দু'খণ্ডে ভাগ করতে উদ্যত হয়। এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল, 'শুনুন! শুনুন! আমাকে কাটবেন না।' তারপরই তার ভেতর থেকে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর একটি ক্ষুদে বালক লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল।

বুড়ো-বুড়িঅবাক হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ তাদের মুখ দিয়ে কোনো কথা সরল না। ক্ষুদে শিশুটি বলল, 'আপনারা ভয় পাবেন না। স্বর্গের ঈশ্বর আপনাদের নিঃসঙ্গতা লক্ষ করেছেন। আপনাদের কোনো সন্তান নেই দেখে তিনি আমাকে আপনাদের ছেলে হবার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন।'

বৃদ্ধ দম্পতি ভীষণ খুশি হয়ে বালকটিকে তাদের পুত্র বলে গ্রহণ করল। তারা তার নাম দিল মোমোতারো, যার অর্থ পীচ বালক। বুড়ো-বুড়িতাদের অন্তরের সব ভালোবাসা পীচ বালকের উপর ঢেলে দিল এবং তাকে খুব চমৎকার ভাবে বড় করে তুলল।

মোমোতারোর বয়স যখন পনের বছর হল, তখন সে তার বাবা-মায়েরকাছে গিয়ে বলল, 'আপনারা

আমার জন্য অনেক করেছেন। আমি এখন বড় হয়েছি। আমার এই দেশের জন্য কিছু করা উচিত। সমুদ্রের সুন্দর একটা অংশে দানব দ্বীপ বলে একটা দ্বীপ আছে। ওই দ্বীপে অনেকগুলি খুব দুষ্ট দানব বাস করে। তারা মাঝে মাঝে লোকালয়ে হানা দিয়ে লোকজনকে ধরে নিয়ে যায় আর বহু সম্পদ নষ্ট করে। অনেক জিনিস লুট করে নিয়ে যায়। প্রচুর মূল্যবান জিনিস ওরা নিয়ে গেছে। আমি দানব দ্বীপে যাব, ওদের সঙ্গে লড়াই করব, লুণ্ঠিত জিনিসপত্র আমার দেশের জন্য ফিরিয়ে আনব। দয়া করে আমাকে এ কাজটা করতে দিন।'

মোমোতারোর মা-বাবাতার কথা শুনে অবাক হল, একটু গর্বিতও হল। তাদের ছেলে দেশ ও মানুষের জন্য কিছু করতে চায়, এটা তো কম কথা নয়। দানব দ্বীপে যাবার জন্য তারা ওকে সাহায্য করল। বৃদ্ধ ওকে একটা তরবারি আর কিছু অস্ত্র দিল, বৃদ্ধা তাকে পথে খাবার জন্য অনেকগুলি পিঠা বানিয়ে দিল। মোমোতারো তখন তার অভিযান শুরু করল। সে তার বাবা-মাকেকথা দিল যে শিগগির সে আবার তাদের কাছে ফিরে আসবে।

মোমোতারো সাগরের দিকে হাঁটতে শুরু করে। দীর্ঘ পথ। যেতে যেতে তার দেখা মিলল একটা লালচে-ধূসররঙের কুকুরের। কুকুরটা মোমোতারোকে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে করতে তার দিকে তেড়ে এল, মনে হল এক্ষুণি তার পায়ে কামড় বসিয়ে দেবে। কিন্তু ঠিক তখনই মোমোতারো কুকুরটিকে তার একটা পিঠা দিয়ে বলল যে, সে দানবের সঙ্গে লড়ার জন্য দানব দ্বীপে যাচ্ছে। তার কথা শুনে কুকুরটি বলল, সেও মোমোতারোর সঙ্গে যাবে, ওই যুদ্ধে সে মোমোতারোকে সাহায্য করবে।

মোমোতারো আর লালচে-ধূসরকুকুর চলতে থাকে। একটু পর তাদের সঙ্গে একটা বানরের দেখা হল। কুকুর আর বানরের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে মারামারি শুরু হয়। কিন্তু মোমোতারো বানরকে জানাল যে, তারা দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দানব দ্বীপে যাচ্ছে। বানর জিজ্ঞাসা করল, সে কি ওদের সঙ্গে যেতে পারে? মোমোতারো তার সম্মতি দিয়ে তাকে একটা পিঠা খেতে দিল। এবার বানরও তাদের সাথি হল।

মোমোতারো, লালচে-ধূসর কুকুর আর বানর হাঁটতে থাকে। অল্প কিছুক্ষণ পর তাদের দেখা হল লম্বা লেজবিশিষ্ট একটা রঙিন ফিজনট্ পাখির সঙ্গে। কুকুর, বানর আর পাখিটি মারামারি করার প্রস্তুতি নিতেই মোমোতারো পাখিকে বলল, তারা দানবদের সঙ্গে লড়ার জন্য দানব দ্বীপে যাচ্ছে। তার কথা শুনে পাখি জিজ্ঞাসা করল, সে কি ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারে? মোমোতারো তখন তাকে একটা পিঠা দিয়ে তাদের সঙ্গী হবার অনুমতি প্রদান করল।

আর এইভাবে মোমোতারোর নেতৃত্বে যে কুকুর, বানর আর ফিজন্ট পাখি সাধারণত একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে মেতে থাকত তারা একে অপরের খুব ভালো বন্ধু হয়ে উঠল। তারপর দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে তারা এক সময় সমুদ্রে এসে পৌঁছুল। সেখানে তারা একটা নৌকা বানিয়ে দানব দ্বীপের উদ্দেশে যাত্রা করল।

এক সময় বেশ দূরে থাকতেই তারা দানব দ্বীপ দেখতে পায়। তারা দেখল একটা বড় সুরক্ষিত দুর্গ। একটু কাছে যেতেই তাদের চোখে পড়ল অসংখ্য দৈত্য-দানব,কারো রঙ লাল, কারো নীল, কারো গাঢ় কালো।

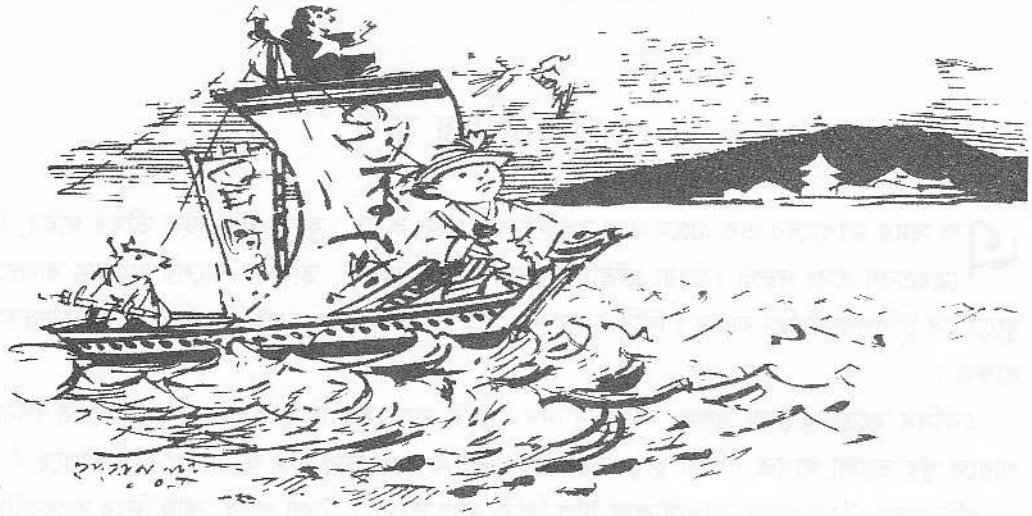

এবার সকালের আগে ফিজনট্ পাখি দুর্গের দেয়ালের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে তার তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে দানবদের মাথায় ঠোকর দিতে শুরু করল। দানবেরা তাদের গদা ঘুরিয়ে পাখিটিকে মারার চেষ্টা করল। কিন্তু ওই পাখি ছিল অসম্ভব দ্রুতগতি সম্পন্ন, সে এক মুহূর্তের জন্য এক জায়গায় স্থির থাকে না। দানবের দল তার অত্যাচারে অস্থির হয়ে যায়।

এই অবসরে বানর সবার অলক্ষ্যে দুর্গে ঢুকে গিয়ে তার ফটক খুলে দিল। মোমোতারো আর কুকুর এক ছুটে দুর্গে প্রবেশ করল।

তারপর শুরু হল ধুন্দুমার যুদ্ধ। পাখি দানবের মাথা ঠোকরাতে থাকে, বানর তার তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে তাদের শরীর খামচে দেয়, কুকুর তাদের দেহে তার দাঁত বসিয়ে ভীষণভাবে কামড়ে দেয়, আর মোমোতারো তার তরবারি দিয়ে তাদের কচুকাটা করে।

যুদ্ধে দানবদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তারা অবনত মস্তকে মোমোতারোর ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা আর কোনোদিন মানুষের আবাসভূমিতে হানা দেবে না, আর কখনো কোনো খারাপ কাজ করবে না। এরপর তারা যেসব জিনিস লুণ্ঠন করে এনেছিল, তা সব মোমোতারোকে ফিরিয়ে দিল।

সে যে কী চোখ ঝলসানো ঐশ্বর্য তা তোমরা কল্পনা করতে পারবে না। সোনা রূপা মণি মুক্তা চুনী পান্নার বহু অলঙ্কার ছিল সেখানে। মোমোতারো আর তার তিন বন্ধু সেই সব তাদের নৌকায় তুলে সাগর পাড়ি দিয়ে ডাঙায় ফিরে এল। তারপর ওই রত্নরাজি একটা গাড়িতে তুলে তারা তাদের যাত্রা শুরু করল। পথে যেতে যেতে তারা লুট করা জিনিসপত্র তাদের প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিল। সবাই মোমোতারোর উদ্দেশে সকৃতজ্ঞ জয়ধ্বনি দেয়।

তারপর এক সময় মোমোতারো আপন গৃহে ফিরে আসে। তার বাবা-মা তাকে দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। মোমোতারো তাদের জন্যও অনেক ধনরত্ন নিয়ে এসেছিল। তারা এখন রীতিমতো বিত্তবান মানুষ। মোমোতারো আর তার মা-বাবাপরম সুখে দিন কাটাতে থাকে।

কৃতজ্ঞ ছয় মূর্তি

এক সময় জাপানের এক গ্রামে এক বৃদ্ধ দম্পতি বাস করত। বুড়ো-বুড়ি ছিল ভীষণ গরিব, কিন্তু খুব স্নেহপ্রবণ এবং দয়ালু। তারা প্রতিদিন শোলার টুপি বানাত, তারপর পাশের শহরের বাজারে গিয়ে বুড়ো সে টুপিগুলি বিক্রি করত। বিক্রি করে যে সামান্য অর্থ পেত, তাই দিয়ে তারা কোনোরকম বেঁচে থাকত।

একদিন বুড়ো বুড়িকে বলল, 'আর দু'দিন পরেই নববর্ষের দিন, সেদিন কিছু চালের পিঠা খেতে পারলে খুব ভালো লাগত। পিঠা ছাড়া নববর্ষের দিনের কথা ভাবতেই আমার খারাপ লাগছে।'

বুড়ি বলল, 'ঠিক আছে আগামীকাল টুপি বিক্রি করে তুমি যে টাকা পাবে, তাই দিয়ে কয়েকটা চালের পিঠা কিনে এনো।'

পরদিন বুড়ো খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সদ্য বানানো পাঁচটা নতুন টুপি নিয়ে বাজারে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন বুড়োর একটা টুপিও বিক্রি হল না। তার উপর আরো দুর্ভাগ্য। হঠাৎ ভীষণ বরফ পড়তে আরম্ভ করল।

বুড়ো দুঃখিতচিত্তে ক্লান্ত-মন্থর পায়ে বাড়ির পথে ফিরে চলে। ওই পথ চলে গিয়েছিল একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে। হঠাৎ বুড়োর চোখে পড়ল যে, ওই নির্জন পথের এক পাশে ছয়টি পাথরের জিজো প্রতিমূর্তি নীরব-নিশ্চলহয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জিজো ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রক্ষাকর্তা। মূর্তিগুলির সর্বাঙ্গ ঘন বরফে ছেয়ে গেছে। বুড়ো মূর্তিগুলি লক্ষ করতে করতে বলল, 'কী কাণ্ড! পাথরের মূর্তি হলে কী হবে– এই রকম ঘন তুষারপাতে ওরা নিশ্চয়ই ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। ওদের মাথায় তো টুপিও নাই।'

বুড়ো চুপ করে একটুক্ষণ ভাবল, তারপর মনে মনে বলল, 'আমি জানি কী করতে হবে।' সে তার নতুন বানানো টুপিগুলি মূর্তিগুলির মাথায় পরিয়ে দিল। কিন্তু পাঁচটি মূর্তির মাথায় টুপি পরিয়ে দেবার পর সে দেখল যে, আরো একটা মূর্তি বাকি আছে। তখন বুড়ো তার নিজের মাথায় বাঁধা বড় রুমালটা খুলে সেটা দিয়ে ষষ্ঠ মূর্তির মাথা বেঁধে দিল। তারপর সে নিজের বাড়িতে ফিরে এল।

বুড়ি আগুনের পাশে বসে বুড়োর জন্য অপেক্ষা করছিল। বুড়োকে এক নজর দেখেই সে আর্তচিৎকার করে উঠল, 'ওহ, তুমি যে ভীষণ ভিজে গেছ। এসো, এসো, তাড়াতাড়ি আগুনের পাশে এসে বসো। আর তোমার মাথার রুমাল কী হল?'

বুড়ো তার স্ত্রীকে তখন সব কাহিনী খুলে বলল। সে তার স্ত্রীর কাছে দুঃখপ্রকাশ করে বলল যে, সে কোনো চালের পিঠা আনতে পারেনি এবং সেজন্য তার খুব খারাপ লাগছে।

বুড়ি বলল, তাঁর জন্য তুমি একটুও মন খারাপ করো না। তুমি খুব ভালো একটা কাজ করেছ। ওই বেচারা মূর্তিগুলি নিশ্চয়ই ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল। হাত দিয়ে গা-মাথারবরফ ঝেড়ে ফেলারও তো তাদের কোনো উপায় ছিল না।' বুড়ির কথা শুনে বুড়োর মন ভালো হয়ে যায়।

ততক্ষণে অনেক রাত হয়ে গিয়েছেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা দু'জন গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়।

ঠিক ভোর হবার আগে, তখন তারা দু'জনে ঘুমে অচেতন, একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। তাদের মন হল,

দূর থেকে যেন একটা গানের শব্দ ভেসে আসছে। কারা যেন গাইছে–

'বরফের মধ্য দিয়ে হেঁটে আসে
দয়ালু এক বুড়ো।
তার কাছ থেকে তার সব টুপি পাই
আমরা পাথরের ছয় জিজো।
তার প্রতিদানে তার জন্য আমরা এনেছি কিছু উপহার,
আমরা গাই বুরোড়ার জয় জয়কার।'

গানের ধ্বনি ক্রমে আছে আসতে আসতে বুড়ো-বুড়িরদরজার সামনে এসে থামে। তারপর একটা বেশ জোরে শব্দ হয়। কেউ যেন তাদের দরজার সামনে খুব বড় এবং ভারী কোনো জিনিস ধপ করে নামিয়ে রাখল। তারপর আবার গানের ধ্বনি ও কয়েকটা পায়ের শব্দ নিচু হতে হতে প্রায় মিলিয়ে গেল।

বুড়ো-বুড়িততক্ষণে সম্পূর্ণ জেগে গিয়েছিল। তারা কোনো রকম গায়ে কাপড় জড়িয়ে ছুটে দরজার কাছে আসতেই দেখতে পেল যে, সেখানে রয়েছে খুব সুন্দর দেখতে বিশাল আকারের একটা চালের পিঠা। অত সুন্দর এবং অত বড় পিঠা কেউ কখনো দেখেনি। তারা চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'এই চমৎকার উপহার কে দিল আমাদের?' এক সময় বরফের বুকে কয়েকটা পায়ের ছাপ তাদের চোখে পড়ল। ততক্ষণে ঊষার স্নিগ্ধ আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। সেই আলোতে বুড়ো-বুড়ি দেখল যে, দূরে পাথরের ছয় জিজো তাদের পাহাড়ের দিকে হেঁটে যাচ্ছে, তাদের মাথায় তখনো পাঁচটি শোলার টুপি ও একটা রুমাল।

বুড়ি বুড়োকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি ওদের প্রতি দয়া দেখিয়েছিলে, ওরা তার প্রতিদান দিয়ে গেল।'

বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীবিশাল ও সুস্বাদু চালের কেকটি দিয়ে মাহাআনন্দে তাদের নববর্ষের দিন উদযাপন করল।

কাঁকড়া ও বানর

এক কাঁকড়া ও এক বানর একদিন বেড়াতে বের হল। পথে চলতে চলতে বানর একটা খেজুরের বিচি পেল, আর কাঁকড়া পেল একটা চালের পিঠা। চালের পিঠা খাবার জন্য বানরের ভীষণ লোভ হয়। বানর ছিল কথাবার্তায় খুব পটু। সে কাঁকড়াকে ভুলিয়ে-ভালিয়েতার সঙ্গে নিজের খেজুর বিচিকে বদলে কাঁকড়ার কাছ থেকে চালের পিঠাটা নিয়ে নিল। মুহূর্তের মধ্যে বানর পিঠাটা খেয়ে ফেলল।

এদিকে কাঁকড়ার পক্ষে খেজুরের বিচি খাওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু সে বিচিটা বাড়িতে এসে তার বাগানে রোপণ করল। কাঁকড়া রোজ সেখানে পানি দেয়, চারপাশের আগাছা পরিষ্কার করে, সর্ব প্রকার যত্ন নেয়। ছোট্ট বিচি থেকে এক সময় একটা বড় গাছ হল এবং শরতের এক অপরাহ্নে কাঁকড়া দেখল যে, তার গাছ লাল-খয়েরিরঙের খেজুরে-খেজুরেভরে গেছে। ওই খেজুর খাবার জন্য তার মন-প্রাণ আইঢাই করে উঠল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে গাছে উঠতে পারল না। তখন সে তারা বন্ধু বানরের কাছে গিয়ে তার জন্য কিছু খেজুর পেড়ে দিতে অনুরোধ করল।

এদিকে বানরের কাছে চালের পিঠার চাইতেও বেশি প্রিয় ছিল খেজুর। সে তরতর করে গাছে উঠে গেল, তারপর একটার পর একটা খেজুর খেতে লাগল। সে পাকা নরম খেজুরগুলি খায় আর কাঁচা শক্তগুলি নিচে কাঁকড়ার জন্য ফেলে দেয়। কাঁকড়া সেগুলি খেতে পারে না। আর এরই মধ্যে একটা শক্ত খেজুর তার মাথার উপর সজোরে পড়ল। কাঁকড়া বেশ ব্যথা পায়, খুব রাগও হয় তার।

ক্রুদ্ধ কাঁকড়া এবার তার তিন বন্ধুর কাছে গিয়ে অনুরোধ করল, তারা যেন বানরকে তার অপকর্মের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেয়। বন্ধু তিনজন হল একটা হামানদিস্তা, একটা বোলতা আর একটা বাদাম। কাঁকড়ার সব কথা শুনে তারা তিন বন্ধু তার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হল।

তারা একদিন কাঁকড়ার বাড়ির কাছে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকল আর কাঁকড়া তখন

বানরের বাড়ি গিয়ে বানরকে তার বাড়িতে চা-নাস্তা খাবার আমন্ত্রণ জানাল। বানর কাঁকড়ার বাড়িতে এসে পৌঁছুলে কাঁকড়া তাকে আগুনের চুল্লির পাশে আদর করে বসায়। কাঁকড়ার বন্ধু বাদাম তখন চুল্লির ছাইয়ের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে মুচমুচে করে ভেজে নিচ্ছিল। হঠাৎ সে সশব্দে ফেটে গিয়ে আগুনসহ বানরের গায়ের উপর এসে পড়ল। বানরের ঘাড়ের অনেকটা জায়গা পুড়ে যায়। সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে লাফ দিয়ে ওঠে।

আর ঠিক তখনই বোলতা গুঞ্জন করতে করতে উড়ে এসে বানরের লেজে তার তীক্ষ্ণ হুঁল বসিয়ে দিল। বানর চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু হামানদিস্তা কাঁকড়ার ঘরের দরজার উপরে লুকিয়ে বসে ছিল। বানর দরজার কাছে আসতেই সে ধুপ করে তার পিঠের উপর পড়ল। বানর তার পিঠে খুব আঘাত পেল।

বানর বুঝল যে, তার পালাবার কোনো উপায় নাই। সে কাঁকড়া আর কাঁকড়ার তিন বন্ধুর কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করল। সে বলল, 'আমি কাঁকড়ার সুস্বাদু পাকা খেজুরগুলি খেয়ে ওর জন্য কাঁচা শক্ত ফলগুলি নিচে ফেলে খুব খারাপ কাজ করেছি। ও রকম কাজ আমি কখনো করব না। দয়া করে আমাকে তোমরা মাফ করে দাও।'

কাঁকড়া বানরকে ক্ষমা করে দিল এবং আবার তারা পরস্পরের বন্ধু হল। বানর আর কখনো কাউকে ঠকাবার চেষ্টা করেনি, তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল।

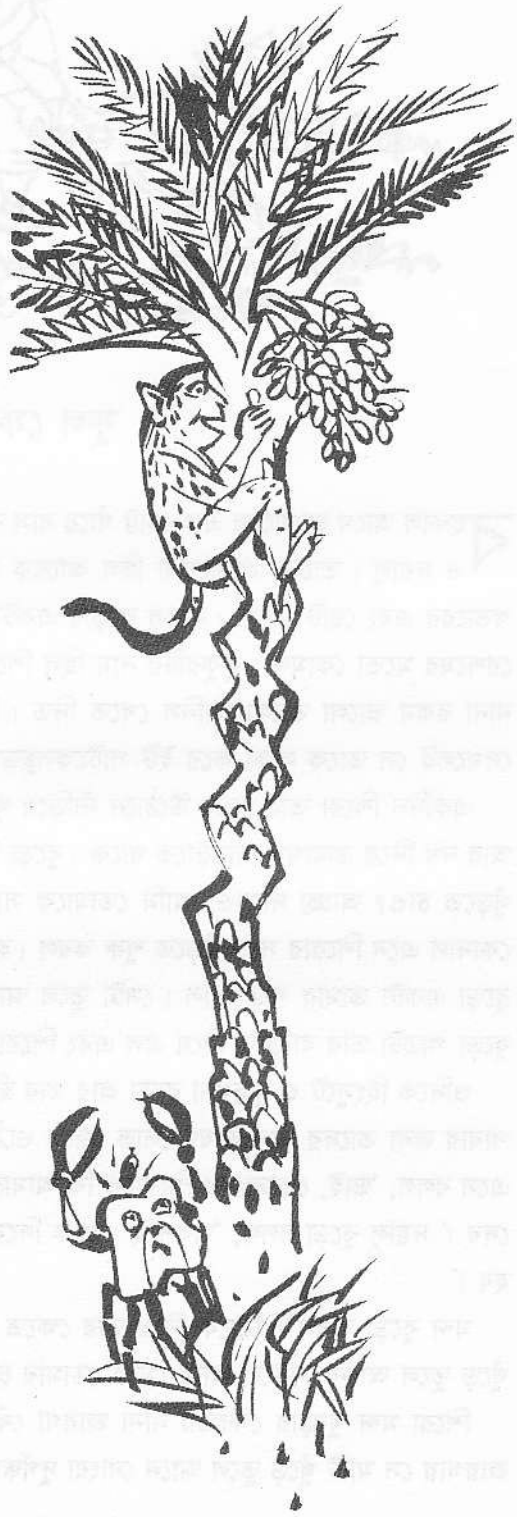

ফুল ফোটানো বুড়ো

বহুকাল আগে জাপানের এক ছোট্ট গাঁয়ে বাস করত এক বুড়ো আর এক বুড়ি। বুড়ো ছিল খুব স্নেহশীল ও দয়ালু। তাদের প্রতিবেশী ছিল আরেক বুড়ো আর আরেক বুড়ি। ওই বুড়ো ছিল খুব হিংসুটে স্বভাবের এবং ছোট মনের। দয়ালু বুড়োর একটা ছোট্ট সাদা রঙের কুকুর ছিল। তার গায়ের লোম ছিল রেশমের মতো কোমল। কুকুরটির নাম ছিল শিরো। দয়ালু বুড়ো-বুড়িশিরোকে খুব ভালোবাসত, তাকে নানা রকম ভালো ভালো জিনিস খেতে দিত। কিন্তু অপর বুড়োটি শিরোকে দেখতে পারত না, ওকে দেখলেই সে তাকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেলছুড়ত।

একদিন শিরো তার প্রভুর উঠোনে দাঁড়িয়ে খুব জোরে ডাকতে থাকে। সে একটা জায়গায় তার পা আর নখ দিয়ে ক্রমাগত আঁচড়াতে থাকে। বুড়ো শিরোর কাণ্ড দেখে তার কাছে এসে বলল, 'তুমি এখানে খুঁড়তে চাও? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমাকে সাহায্য করব।' দয়ালু বুড়ো বাড়ির ভেতর থেকে একটা কোদাল এনে শিরোর সঙ্গে খুঁড়তে শুরু করল। হঠাৎ ঠং করে একটা শব্দ হয়। আরো একটু খোঁড়ার পর বুড়ো একটা তামার পাত্র পেল। সেটা তুলে আনতেই দেখা গেল যে, ওই পাত্র স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ। দয়ালু বুড়ো পাত্রটা তার বাড়িতে নিয়ে এল এবং শিরোকে অনেক ধন্যবাদ জানাল আর আদর করল।

ওদিকে হিংসুটে ও ক্ষুদ্রমনা বুড়ো আর তার স্ত্রী তাদের বাড়ি থেকে চুপিচুপি সব লক্ষ্য করছিল। সোনা পাবার জন্য তাদের মনে ভীষণ লোভ জেগে ওঠে। লোভী আর হিংসুটে বুড়ো তখন দয়ালু বুড়োর কাছে এসে বলল, 'ভাই, তোমাদের শিরোকে কি আমাকে একটু ধার দেবে? কিছুক্ষণ পরই আমি ওকে ফিরিয়ে দেব।' দয়ালু বুড়ো বলল, 'অবশ্যই। ওকে দিয়ে যদি তোমার কোনো সাহায্য হয়, তাহলে আমি খুশিই হব।'

মন্দ বুড়ো তখন শিরোকে নিয়ে তার ক্ষেতে গিয়ে বলল, 'শিরো, এবার আমার জন্য স্বর্ণমুদ্রার পাত্র খুঁড়ে তুলে আনো, নইলে আমি মেরে তোমার চার-পাভেঙে দেব।'

শিরো মন্দ বুড়োর ক্ষেতের নানা জায়গা খোঁড়ে কিন্তু কোথাও কোনো তামার পাত্র পায় না। এক জায়গায় সে মাটি খুঁড়ে তুলে আনে নোংরা দুর্গন্ধময় পচা কিছু আবর্জনা। মন্দ বুড়ো ক্ষেপে গিয়ে শিরোর

মাথায় তার কোদাল দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে বেচারা শিরোর মৃত্যু হল।

দয়ালু বুড়ো আর তার স্ত্রীর খুব মন খারাপ হয়ে যায়। তারা তাদের জমিতে শিরোকে কবর দেয় এবং তার কবরের উপর একটা পাইন বৃক্ষ রোপণ করে। তারা রোজ শিরোর কবরে যায় এবং সস্নেহে পাইন গাছের গোড়ায় জল দেয়। গাছটি তরতর করে দ্রুত বেড়ে ওঠে।

একদিন দয়ালু বুড়োর স্ত্রী তার স্বামীকে লক্ষ করে বলল, 'তোমার মনে আছে, শিরো চালের পিঠা খেতে কী রকম ভালোবাসত? আমরা এই গাছ কেটে এর গুঁড়ি দিয়ে চমৎকার একটা উদুখল বানাতে পারি, তারপর সেখানে মিহি করে চাল গুঁড়ো করে আমরা শিরোর স্মৃতিতে কয়েকটা চালের পিঠা বানাব। কি বলো তুমি?'

বুড়ো সম্মতি দেয়। তখন পাইন গাছটা কাটা হয় ও উদুখল তৈরি হয়। দয়ালু বুড়ো তখন তার উদুখলে বেশ খানিকটা চাল ঢেলে দিয়ে সজোরে তা চূর্ণ করতে শুরু করে। কিন্তু একটু পরেই সে দেখতে পায় যে, তার উদুখলে চালের গুঁড়ো নেই, সেখানে দেখা যাচ্ছে গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা। দয়ালু বুড়ো আর বুড়ি তখন খুব ধনী এক দম্পতিতে পরিণত হয়।

ওদিকে হিংসুটে মন্দ বুড়ো, তার স্ত্রী তাদের বাড়ির জানালা দিয়ে সব কিছু দেখছিল। তারা ভাবল, ওই উদুখল দিয়ে তারাও সোনার গুঁড়ো বানাবে। মন্দ বুড়ো দয়ালু বুড়োর কাছ থেকে তার উদুখল ধার করে নিয়ে যায় এবং সেখানে চাল ঢেলে গুঁড়ো করতে শুরু করে। কিন্তু সেখানে সোনার গুঁড়োর পরিবর্তে দেখা দিল কিছু নোংরা দুর্গন্ধময় আবর্জনা। তা দেখে মন্দ বুড়ো ভীষণ ক্ষেপে যায়। সে তার কুঠার দিয়ে উদুখলটা কেটে টুকরো টুকরো করে নিজের উনুনের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়।

দয়ালু বুড়ো যখন প্রতিবেশীর কাছ থেকে তার উদুখল ফেরত নিতে গেল, তখন দেখল যে, সেটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ওই উদুখল তাকে শিরোর কথা মনে করিয়ে দিত। সে মন্দ বুড়োকে অনুরোধ করে কিছু ছাই সঙ্গে নিয়ে এল।

তখন ছিল শীতকাল। কোথাও কোনো সতেজ সজীব গাছপালা নাই, কোনো ফলফুল নাই। দয়ালু বুড়ো ভাবল, এই সময় বাগানে এই ছাই ছড়িয়ে দিই। সে তাই করল এবং কী অবাক কাণ্ড! দেখতে দেখতে বাগানের সব চেরিগাছ উজ্জ্বল গোলাপি রঙের ফুলে ভরে গেল। আশেপাশের সবাই ওই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য দেখার জন্য দয়ালু বুড়োর বাগানে ছুটে এল। কাছেই তাঁর প্রাসাদে বাস করতেন এক যুবরাজ। তিনিও এ দৃশ্য দেখার জন্য দয়ালু বুড়োর বাগানে এসে হাজির হলেন।

এদিকে যুবরাজের প্রাসাদের বাগানেও একটা চেরিগাছ ছিল। ওই গাছটি ছিল তাঁর খুব প্রিয়। তিনি অধীরভাবে অপেক্ষা করতেন কখন বসন্ত আসবে, কখন তার চেরিগাছে ফুল ফুটবে। কিন্তু এবার বসন্ত এলে তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে দেখলেন যে, তাঁর চেরিগাছটা মরে শুকনো কাঠ হয়ে গেছে। যুবরাজের ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি দয়ালু বুড়োকে ডেকে পাঠালেন এবং তার মরা গাছটি বাঁচিয়ে তোলার জন্য অনুরোধ করলেন।

দয়ালু বুড়ো তার ঝুলিতে কিছু ছাই নিয়ে যুবরাজের চেরিগাছে উঠে গেল। তারপর সে গাছটির মরা ডালপালার ওপর তার ছাই ছড়িয়ে দিতে শুরু করল। আর কী আশ্চর্য, চোখের পলকে গাছটি অপূর্ব সুন্দর চেরিফুলের গুচ্ছে গুচ্ছে পূর্ণ হয়ে গেল। অত সুন্দর ফুল কেউ কোথাও কখনো দেখেনি।

যুবরাজ অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি দয়ালু বুড়ো ও স্ত্রীকে অনেক মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিলেন এবং বুড়োকে ভূষিত করলেন একটা নতুন উপাধিতে 'ফুল ফোটানো স্যার মাননীয় বৃদ্ধ।'

সাগর পাড়ি দেয়া খরগোশ

অনেক দিন আগের কথা। একটা খরগোশের সাগর পাড়ি দেয়ার ভীষণ শখ হয়। সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউয়ের ওপারে তার চোখে পড়ে একটা অতি সুন্দর দ্বীপ। ওই দ্বীপে যাবার জন্য তার সারা মন আনচান করে। কিন্তু কেমন করে সে ওখানে যাবে? সে তো সাঁতার জানে না। কোথাও কোনো নৌকা বা জাহাজও সে দেখতে পায় না। এমন সময় তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল।

সে সমুদ্রের বুকে একটা হাঙরকে দেখতে পেয়ে তাকে ডেকে বলল, 'ওহে মিস্টার হাঙর, আপনার আর আমার মধ্যে সব চাইতে বেশিসংখ্যক বন্ধু আছে কার?'

হাঙর জবাব দিল, 'আমার বন্ধুর সংখ্যা যে তোমার চাইতে অনেক বেশি, সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।'

খরগোশ বলল, 'ঠিক আছে, গুনেই দেখা যাক। এক কাজ করুন। এখান থেকে ওই দ্বীপ পর্যন্ত আপনি আপনার বন্ধুদের নিয়ে এক সারিতে অবস্থান নিন। আমি গুনে দেখি আপনার বন্ধুর সংখ্যা কত।'

হাঙরগুলি তখন সমুদ্রের বুকে সারি বেঁধে অবস্থান নিল আর খরগোশ লাফ দিতে দিতে একটার পিঠের উপর দিয়ে আরেকটার পিঠে যায়। সে গুনতে থাকে, 'এক, দুই, তিন, চার...' আর এক সময় সে দ্বীপটাতে পৌঁছে যায়।

দ্বীপের মাটিতে পা দিয়ে খরগোশ হাঙরগুলির দিকে তাকিয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে বলল, 'কেমন বুদ্ধু বানালাম তোমাদের! তোমরা আমার জন্য যে কী চমৎকার সেতু তৈরি করে দিয়েছ তা বুঝতেও পারেনি তাই না?'

হাঙরগুলির খুব রাগ হয়। একটা হাঙর তার তীক্ষ্ণ দাঁত বাড়িয়ে খরগোশের গায়ের নরম মোটা লোমের খানিকটা ছিঁড়ে ফেলে।

খরগোশ ব্যথায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'উহ, ভীষণ লেগেছে আমার।' সে গুন গুন করে কাঁদতে বসে।

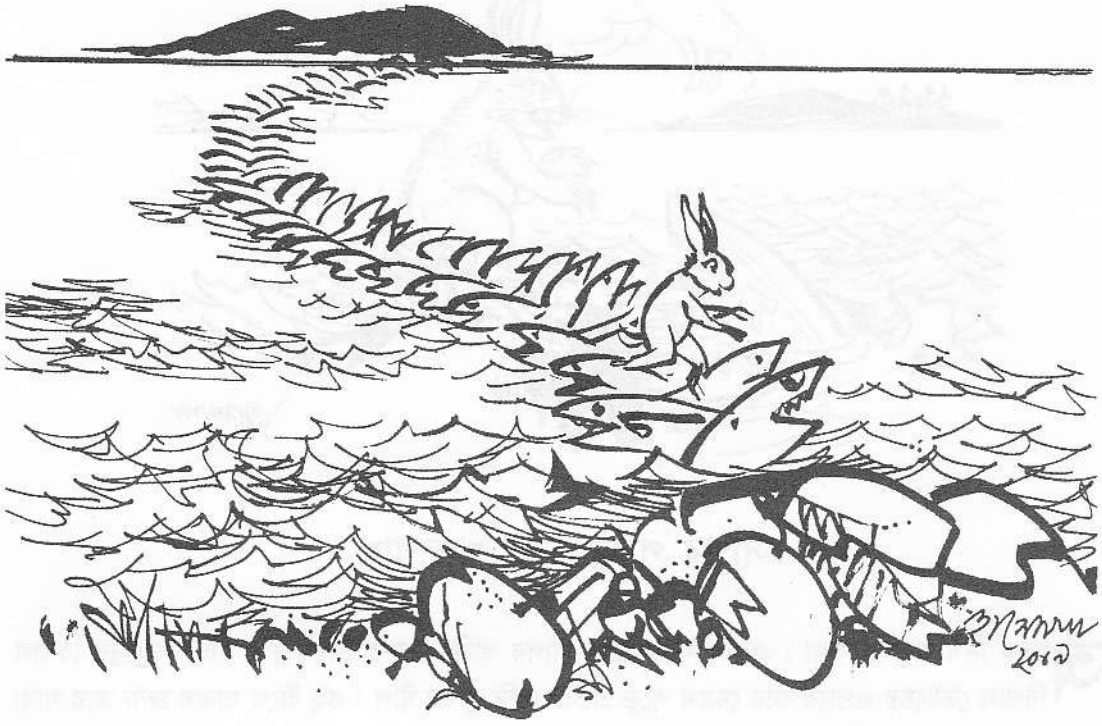

ঠিক ওই সময় দ্বীপের রাজা ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি খরগোশের কাছে জানতে চাইলেন কী হয়েছে, ও কাঁদছে কেন? তিনি সব কিছু শুনে বললেন, 'কাউকে মিথ্যা কথা বলে বোকা বানানো অতিশয় মন্দ কাজ। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা করো যে, ও রকম কাজ আর তুমি কখনো করবে না, তাহলে আমি তোমার হারানো লোমের ব্যবস্থা করে দেব।'

খরগোশ বলল, 'এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ও রকম কাজ আমি আর কখনো করব না।'

রাজা তখন পাশের নলখাগড়ার বন থেকে কিছু নলখাগড়া এনে সেগুলির সাহায্যে খরগোশের জন্য একটা বাসা তৈরি করে দিয়ে বললেন, 'এখন তুমি তোমার এই নলখাগড়ার বাসায় ঘুমিয়ে থাকো। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তুমি দেখবে যে, তোমার খোয়ানো লোম যথাস্থানে আবার নতুন করে গজিয়েছে।'

খরগোশ রাজার কথামতো কাজ করে। পরদিন সকালে সে কৃতজ্ঞ অন্তরে রাজার কাছে গিয়ে বলল, 'মহারাজ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যথাস্থানে আমার নতুন লোম গজিয়েছে। আপনাকে অসংখ্য-অসংখ্য ধন্যবাদ, মহারাজ।'

খরগোশ খুশিমনে লাফাতে লাফাতে সমুদ্র তীরে বেড়াতে গেল। সে দিন থেকে মিথ্যা কথা বলে সে আর কাউকে কোনোদিন বোকা বানাবার চেষ্টা করেনি।

জিহ্বা কাটা চড়ুই পাখি

একদা এক বৃদ্ধ চাষি ছিল। সে ছিল দয়ালু এবং কোমল স্বভারের, কিন্তু তার স্ত্রী ছিল যেমন কৃপণ, তেমনি বদমেজাজি। ওদের কোনো ছেলেপুলে হয়নি। ওই অভাব মেটাবার জন্য বুড়ো একটা ছোট্ট চড়ুই পাখিকে আপন করে নিয়েছিল। সে পাখিটির যত্ন নেয়, তার চাষের জমি থেকে ফিরে এসেই তাকে আদর করে, রাতের খাওয়ার সময় না হওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে অনেক কথা বলে, তাকে নানা গল্প শোনায়। তারপর খেতে বসলে সে তার নিজের পাত্র থেকে চড়ুইটির মুখে খাবার তুলে দেয়। মনে হয় চড়ুইটি যেন বুড়োর ছেলে।

কিন্তু বুড়ি পাখিটির প্রতি, শুধু পাখিটির প্রতি কেন, তার সারা জীবনে কোনো পশু-পাখি কিংবা কোনো মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র স্নেহ বা দয়া দেখায়নি। ওই চড়ুই পাখিটিকে সে বিশেষ করে দু'চোখে দেখতে পারত না। ওই রকম একটা হতচ্ছাড়া প্রাণীকে বাড়িতে রাখার জন্য সে তার স্বামীকে সারাক্ষণ গালি দিত। বিশেষ করে যে দিন কাপড়-জামাধুতে হত, সেদিন তার মেজাজ বিশেষভাবে খারাপ হয়ে যেত। সব রকম ভারী কাজ ছিল বুড়ির ভীষণ অপছন্দ।

একদিন বুড়ো চাষি যখন ক্ষেতে চাষের কাজে ব্যস্ত, তখন বুড়ি বাড়িতে কাপড় ধোয়ার প্রস্তুতি নেয়। বুড়ি মাড় বানিয়ে সেটা ঠাণ্ডা হবার জন্য একটা কাঠের গামলায় রেখে দেয়। বুড়ি অন্যদিকে পিঠ ফেরাতেই চড়ুইটা লাফাতে লাফাতে গামলার কিনারে এসে মাড়ের মধ্যে তার মুখ ডুবিয়ে দেয়। ঠিক সেই মুহূর্তে বুড়ি মুখ ফিরিয়ে চড়ুই'র কাণ্ড দেখে ভীষণ ক্ষেপে যায়। সে একটা কাঁচি হাতে তুলে নিয়ে এক পোঁচে পাখির জিহ্বা কেটে ফেলল। তারপর জিভকাটা চড়ুইটিকে আকাশের বুকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বুড়ি চিৎকার করে বলল, 'যা এবার, তোর যেখানে খুশি চলে যা, এখানে আর কখনো ফিরে আসবি না।' বেচারা চড়ুইটি বনের দিকে উড়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর বৃদ্ধ চাষি বাড়ি ফিরে তার প্রিয় চড়ুইকে কোথাও দেখতে পায় না। সে এখানে খোঁজে, ওখানে খোঁজে, তন্নতন্ন করে সর্বত্র খোঁজে, কিন্তু কোথাও সে পাখিটিকে দেখতে পায় না। অবশেষে বুড়ি কী করেছে তা তার স্বামীকে বলে। তার কথা শুনে বুড়োর ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। পরদিন সকালে সে পাখিটির খোঁজে বনের দিকে যাত্রা করে। যেতে যেতে সে বিষণ্ন সুরে বলতে থাকে, 'ওরে আমার ছোট্ট চড়ুই, কোথায় গেলি তুই? আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলি তুই?'

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে চড়ুই পাখিটি বুড়ো চাষির সামনে এসে উপস্থিত হয়। তার পরনে এক সুন্দরী নারীর কিমোনো, সে কথা বলে মানুষের ভাষায়। সে বলল, 'ওগো আমার প্রিয় প্রভু, আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমার বাড়ি চলুন। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আপনার ক্লান্তি দূর করুন।'

বৃদ্ধ চাষি চড়ুইকে মানুষের মতো কথা বলতে শুনে নিশ্চিত ধরে নিল যে, এটা কোনো মায়াবী চড়ুই পাখি। সে তাকে অনুসরণ করে বনের মধ্যে একটা মনোরম ভবনে গিয়ে পৌঁছল। ওই চড়ুই-এরছিল অনেক ক'টি মেয়ে। তারা বৃদ্ধকে অতি সুস্বাদু নানা রকম খাবার ও পানীয় পরিবেশন করল, তাকে নানা

সুন্দর জিনিস উপহার দিল। চার কন্যা তার সম্মানে মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করল। বুড়ো চাষি সোৎসাহে হাততালি দিয়ে নিজেও তাদের সঙ্গে নাচে যোগ দিল।

দেখতে দেখতে কখন যে রাত নেমে এসেছে, বৃদ্ধ চাষি তা লক্ষও করেনি। সে ওদের জানাল যে, তাকে এখনই বাড়ির পথে ছুটতে হবে, তা না হলে তার স্ত্রী খুব দুশ্চিন্তা করবে। ওরা সবাই তাকে আরো কিছুক্ষণ থাকার জন্য অনেক অনুরোধ করে, কিন্তু বুড়ো কিছুতেই রাজি হয় না। তখন চড়ুই পাখিটি বলল, 'আপনি আমাকে অনেক আদর করেছেন, আমার প্রচুর যত্ন নিয়েছেন, তার সামান্য প্রতিদানস্বরূপ আমি

আপনাকে একটা উপহার দিতে চাই। আপনি তা বাড়ি নিয়ে যাবেন।'

চড়ুই পাখি এই বলে বৃদ্ধের সামনে দু'টি ঝুড়ি রাখল। একটা খুব বড় এবং ভারী, অন্যটি বেশ ছোট এবং হালকা। পাখি বলল, 'এ দুটোর মধ্যে আপনার যেটা খুশি বেছে নিন।' বুড়ো ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট ঝুড়িটি বেছে নেয়। তারপর ওই ঝুড়িটি হাতে নিয়ে সে নিজের বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করল।

বাড়িতে পৌঁছে বুড়ো তার স্ত্রীকে সব ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করল। তারপর তারা দু'জনে মিলে উপহারের ঝুড়িটি খুলল। খুলতেই তারা তার মধ্যে দেখল হীরা, পান্না, চুনী, মুক্তাসহ অনেক মহামূল্যবান পাথর ও স্বর্ণমুদ্রা। তারা এখন তাদের বাকি জীবন মহাসুখে কাটাতে পারবে। আর তারা কখনো কোনো অভাবে পড়বে না।

বৃদ্ধ চাষি এই রকম অভাবিত সম্পদ লাভ করে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়, কিন্তু বুড়ি তাকে তীব্রকণ্ঠে তিরস্কার করে বলে, 'তুমি একটা মহাবোকা! তুমি বড় ঝুড়িটা বেছে নিলে না কেন? তাহলে আরো অনেক বেশি ধন-রত্নপেতাম আমরা। যাই হোক, আমি এখন বড় ঝুড়িটা আনার জন্য চড়ুইর বাড়ি চললাম।'

বুড়ো চাষি তার স্ত্রীকে বলল, 'শোনো, আমরা তো প্রচুর ধন-রত্ন পেয়েছি। কেন অনর্থক বেশি লোভ করছ?' কিন্তু বুড়ি তার বৃদ্ধ স্বামীর কথায় কান দেয় না। সে তার খড়ের স্যাণ্ডেল পায়ে গলিয়ে বনের দিকে পাখির বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করে।

পাখির বাসভবনে পৌঁছে সে খুব মধুর গলায় তার সঙ্গে কথা বলে। পাখি তাকে চা খেতে দেয়। বুড়ি কীভাবে বড় ঝুড়িটির কথা বলবে ভাবতে থাকে। এমন সময় পাখিটিই বলে ওঠে, 'শুনুন, আমি আপনাকে একটা উপহার দিতে চাই।' এই বলে সে বুড়ির সামনে দু'টো ঝুড়ি রাখল, একটা বড় আরেকটা ছোট, তারপর বলল, 'এ দু'টোর মধ্যে আপনার যেটা খুশি সেটা আপনি নিতে পারেন।'

বুড়ি চোখের পলকে বড় ঝুড়িটা আঁকড়ে ধরে বলল, 'আমি এটাই নিলাম।' কথাটা বলেই সে চড়ুই পাখির ভবন থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুতবেগে নিজের বাড়ির পথে চলতে শুরু করল।

এদিকে তার ঝুড়ি ক্রমেই ভারী থেকে আরো ভারী হয়ে উঠতে থাকে। এক সময় একটু বিশ্রাম নেবার জন্য সে পথের পাশে বসে আর মনে মনে ভাবে, এই বড় ঝুড়িটার মধ্যে না জানি কত সোনা-রূপা, মনি-মুক্তা, হীরা-জহরৎআছে! অবশেষে কৌতূহল দমন করতে না পেরে সে ঝুড়ির মুখটা খোলে।

আর তক্ষুণি একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যায়। ঝুড়ির ভেতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে নানা ধরনের কুশ্রী ও বীভৎস প্রাণী– সাপ, ব্যাঙ, ছুঁচো, বোলতা! একটা বোলতা সোজা বুড়ির নাক লক্ষ করে উড়ে আসতে থাকে।

ভয়ে বুড়ির প্রাণ খাঁচা ছেড়ে যাবার উপক্রম হয়। সে মরিয়া হয়ে ছুটতে থাকে। যখন সে কোনো রকমে বাড়ি এসে পৌঁছায়, তখন সে প্রায় অর্ধমৃত। একটু সুস্থ হয়ে সে বুড়োকে তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে অবশেষে বলল, 'শোনো, এই আমি কথা দিলাম, আমি আর কখনো লোভ করব না, কাউকে কোনো রকম গালাগালিও আর কোনোদিন করব না।'

বুড়ি তার কথা রাখে। মনে হয় তার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, কারণ এরপর থেকে সে সবার সঙ্গে সস্নেহে ব্যবহার করতে শুরু করে। যেকোনো পাখি তাদের বাগানে উড়ে এলে বুড়োর সঙ্গে বুড়িও এখন তাকে আদর-যত্নকরে, তাকে নানা রকম খাবার খেতে দেয়।

লম্বা নাকের দুই ভূত

অনেক অনেক দিন আগে জাপানের পূর্বাঞ্চলে সুউচ্চ পর্বতমালায় বাস করত দু'টি লম্বা নাকের ভূত। একটি ছিল সবুজ ভূত, আর অন্যটি ছিল লালভূত। তাদের নাক নিয়ে উভয়েরই গর্বের সীমা ছিল না। তারা ইচ্ছানুযায়ী তাদের নাক লম্বা করতে পারত– পাহাড়-পর্বত, মাঠ-প্রান্তর পেরিয়ে যতদূর তাদের ইচ্ছে ততদূর পর্যন্ত। আর কার নাক বেশ সুন্দর তা নিয়ে সারাক্ষণ তাদের মধ্যে তর্ক চলত।

একদিন তারা পাহাড় চূড়ায় বিশ্রাম নেবার সময় সবুজ ভূত তার নাকে অত্যন্ত চমৎকার একটা গন্ধ পায়। নিচের সমতল ভূমির কোনো এক স্থান থেকে ওই সুমধুর গন্ধ ভেসে আসছিল। সবুজ ভূত মনে মনে বলল, 'ওহো! কী মন মাতানো গন্ধ! ব্যাপারটা কী দেখতে হবে।'

তারপর সে ওই গন্ধ অনুসরণ করে তার নাক লম্বা করতে শুরু করল। এক সময় তার নাক সাতটি পর্বতমালা অতিক্রম করে নিচের সমতল ভূমিতে গিয়ে এক ধনী সামন্তপ্রভুর প্রাসাদের সামনে উপস্থিত হয়।

ওই সময় প্রাসাদের ভেতরে সামন্তপ্রভুর তরুণী কন্যা রাজকুমারী শ্বেতপুষ্প একটা পার্টি দিচ্ছিল। প্রতিবেশী অনেক রাজকন্যা ওই পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। শ্বেতপুষ্প তাদের নিজের অপূর্ব সুন্দর বিরল পোশাকগুলি দেখাচ্ছিল। ওই সব পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে ছিল মন মাতানো সুরভিত ধুনা। ওই ধুনার গন্ধই সবুজ ভূতের নাকে গিয়ে লেগেছিল।

রাজকুমারী শ্বেতপুষ্প তার পোশাকগুলি ঝুলিয়ে রাখার জন্য একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজছিল। হঠাৎ সবুজ ভূতের পুরুষ্ট নাকটা তার চোখে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, 'দেখো দেখো, কে একজন একটা সবুজ দণ্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে। আমরা কাপড়গুলি এর উপর রাখতে পারব।'

শ্বেতপুষ্প তার দাসীদের ডেকে তার নানা রঙের সুন্দর কাপড়-জামাগুলি ভূতের নাকের উপর ঝুলিয়ে দিতে বলল। দাসীরা তার নির্দেশ পালন করে। সে তখন তার নাক নিজের দিকে টেনে নিতে শুরু করল।

রাজকুমারী শ্বেতপুষ্প ও তার বন্ধুরা সুন্দর সুন্দর কাপড়-জামাগুলিকেহঠাৎ হাওয়ায় উড়তে দেখে অবাক হয়ে যায়। তারা খুব তাড়াতাড়ি করে সেগুলি ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু ততক্ষণে বড় বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিল।

সবুজ ভূত ওই সুন্দর কাপড়গুলি তার নাকে ঝুলতে দেখে মহাখুশি হয়। সে কাপড়গুলি গুছিয়ে নিয়ে পাশের পাহাড়ে বাস করা লালভূতকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল।

যথা সময়ে লালভূত তার বাড়িতে উপস্থিত হলে সবুজ ভূত বলল, 'দেখলে তো, আমার এই আশ্চর্য নাক কী রকম কাজের! আমার জন্য এই নাক এই সব সুন্দর রঙিন কাপড়-জামানিয়ে এসেছে।'

ওই চমৎকার জামা-কাপড়গুলিদেখে লালভূতের মন ঈর্ষায় জ্বলে যায়। লালভূতের পক্ষে সবুজ হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না, তা না হলে সে ঈর্ষার আগুনে সবুজ হয়ে যেত।

চটেমটে সে অবশেষে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো, কার নাক সব চাইতে বেশি কাজের, আমি তোমাকে তা দেখাব।'

এরপর লালভূত তার পাহাড়ের চূড়ায় বসে দিনের পর দিন তার লাল নাক ঘষে আর আকাশের বুকে গন্ধ শুঁকে বেড়ায়, কিন্তু কোনো সুগন্ধ তার নাকে এসে লাগে না।

বেশ কিছুকাল কেটে যাবার পর লালভূত অধৈর্য হয়ে পড়ে। সে ঠিক করল, সে আর অপেক্ষা করবে না, তার নাককে লম্বা করে এখনই নিচের সমতলভূমিতে পাঠিয়ে দেবে। তার নাক নিশ্চয়ই সেখানে ভালো কিছু খুঁজে পাবে।

অতএব লালভূত তার নাককে লম্বা করতে আরম্ভ করে এবং এক সময় ওই নাক ওই একই সামন্তপ্রভুর প্রাসাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়।

ঠিক ওই সময়ে সামন্তপ্রভুর যুবক পুত্র মহাবীর তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বাগানে খেলছিল। মহাবীর হঠাৎ একটা লাল দণ্ডকে তাদের মাঝখানে দেখে অবাক হয়ে যায়। সে বলল, 'শোনো, আমরা এই দণ্ডের মধ্যে দড়ি বেঁধে দোলনা বানিয়ে দোলনায় ঝুলব। খুব মজা হবে, তাই না?

যেমন বলা তেমন কাজ। তারা লালভূতের নাকে বাঁধা দোলনায় মহানন্দে দুলতে থাকে। একজন ওই নাকে ছুরি দিয়ে নিজের নাম খোদাই করে।

লালভূত ভীষণ ব্যথা পায়। যন্ত্রণায় সে কেঁপে উঠে বেশ জোরে তার নাম ঝাড়া দেয়। বালকেরা তার নাকের উপর থেকে ঝুপঝুপ করে পড়ে যায়। আর লালভূত আর নাককে যত দ্রুত সম্ভব পাহাড়ের উপর নিজের কাছে টেনে নেয়।

সবুজ ভূত তার অবস্থা দেখে হো হো করে হাসতে থাকে। লালভূত নিজের নাকে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর আমি কাউকে ঈর্ষা করব না। আর কখনো আমি আমার নাককে নিচের সমতলভূমিতে পাঠাব না।'

দৈত্য ও রাতা মোরগ

একটা খুব বড় পাহাড় ছিল, এত উঁচু যে মনে হত তার চূড়া আকাশ ছুঁয়েছে। সেই পাহাড়ের চূড়ায় বাস করত এক ভয়ঙ্কর দৈত্য। তার চুল ছিল আগুনের মতো লাল, আর তার কপাল ফুঁড়ে বেরিয়ে ছিল একটি মাত্র শিং। এই দৈত্য সর্বদা পাহাড়ের নিচে বাস করা চাষিদের নানারকম ক্ষতিসাধন করত।

এক সকালে চাষিরা তাদের ক্ষেতে এসে দেখল, কে যেন তাদের সব ফসল নষ্ট করে দিয়েছে। কোথাও একটা আলু নেই, একটা তরমুজ নেই, একটা শসা নেই, একটা কুমড়া নেই, কিচ্ছু নেই। কে এ কাজ করল? তারা কিছুই ভেবে পায় না। এমন সময় তাদের চোখে পড়ল দৈত্যের পায়ের বড় বড় ছাপ।

চাষিরা দৈত্যের কাণ্ড দেখে ভীষণ রেগে গেল। কত কষ্ট করে তারা তাদের ফসল ফলিয়েছিল, আর এই তার পরিণতি! তারা পাহাড়ের চূড়ার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'শোনো দৈত্য! তুমি খুব খারাপ। কেন তুমি এ কাজ করলে? বাদ দাও এসব কাজ!'

দৈত্য বলল, 'বাদ দিতে পারি যদি তোমরা আমার খাবার হিসাবে প্রতিদিন আমাকে একটি মানুষ উপহার দাও।'

চাষিরা এ রকম অনুরোধের কথা কখনো শোনেনি। তারা বলল, 'কেন তুমি রোজ একজন মানুষ খেতে চাইছ? নিজেকে কী মনে করো তুমি?'

দৈত্য একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার ছেড়ে বলল, 'আমি নিজেকে কি মনে করি? শোনো তাহলে, আমি হলাম দৈত্যকূলের মহা দৈত্যরাজ। আমি করতে পারি না এমন কোনো কাজ নাই।' দৈত্যের প্রচণ্ড গর্জনে গোটা পাহাড় কেঁপে উঠল, গাছপালা সব নিচু আর বাঁকা হয়ে গেল।

চাষিরা একটু চিন্তা করে বলল, 'তুমি যদি এতই শক্তিশালী হও, তাহলে তার একটা প্রমাণ দাও। এক রাতের মধ্যে তুমি যদি আমাদের এই ক্ষেত থেকে পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত এক শ' টা পাথরের সিঁড়ি বানিয়ে দিতে পারো, তাহলে তুমি যা চাইবে তাই আমরা তোমাকে দেব।'

দৈত্য বলল, 'এ তো আমার জন্য খুব সহজ একটা কাজ। কাল সকালে মোরগ ডাকার আগেই আমি এক শ' সিড়ি বানিয়ে দেব। যদি না পারি তাহলে এই আমি কথা দিচ্ছি, আমি আর কখনো তোমাদের জ্বালাতন করব না।'

তারপর রাত নামতেই দৈত্য চুপি চুপি পাহাড় থেকে গ্রামে নেমে এসে গ্রামের সব রাতা মোরগের মাথায় বড় শোলার টুপি পরিয়ে তাদের চোখ ঢেকে দিল, যেন তারা সকালের সূর্যোদয় দেখতে না পায়। তার মানে সূর্যের আলো না দেখলে তারা ডাক দেবে না।

দৈত্য তারপর অতি দ্রুত তার সিঁড়ি বানাবার কাজে লেগে যায়।

ওই পাহাড়ে খুব দয়ালু এক পরীও বাস করত। সে দুষ্টু দৈত্যের কাজ দেখে খুব অসন্তুষ্ট হল। পরী দ্রুতবেগে উড়ে এসে একটা মোরগের মাথার উপর থেকে শোলার টুপি খুলে দূরে ছুড়ে ফেলে দিল। এদিকে দৈত্য নিরানব্বই সিঁড়ি বানিয়ে ফেলেছে। মাত্র আর একটি বাকি। ঠিক ওই মুহূর্তে একটি রাতা

মোরগ সূর্যের আলো দেখতে পেয়ে ডেকে উঠল, 'কক্করো কোঁ, কক্করো কোঁ!' তার ডাক শোনামাত্র সব মোরগ একযোগে ডাকতে শুরু করল, 'কক্করো কোঁ, কক্করো কোঁ!'

দৈত্য অবাক হয়ে ভাবল, 'এটা কেমন করে হল? আর মাত্র একটা সিঁড়ি বাকি ছিল। হেরে গেলাম আমি!' দৈত্যদেরও কথা দিলে কথা রাখতে হয়। এই দৈত্য তার একটি শিং-এহাত বুলাতে বুলাতে বিষণ্ণ চিত্তে দূরে অন্য কোথাও চলে গেল। তাকে আর কখনো এই অঞ্চলে দেখা যায়নি।

চাষিরা তাদের ক্ষেত-খামার নিয়ে আর কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। তারা শেষ সিঁড়িটা বানিয়ে ফেলে এবং সকাল-সন্ধ্যায়পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের চমৎকার দৃশ্য দেখে বিপুল আনন্দ লাভ করে।

হাঁদারাম সাবুরো

অনেক অনেক দিন আগে জাপানের এক কৃষিখামারে একটি ছেলে ছিল। নাম সাবুরো। কিন্তু ছেলেটি এত বোকা ছিল যে, সবাই তাকে ডাকত হাঁদারাম সাবুরো। ওর বুদ্ধির মধ্যে একটা জায়গায় খুব ঘাটতি ছিল। ও কখনোই একটির বেশি দু'টি নির্দেশ মনে রাখতে পারত না। সাবুরোর বাবা-মাওকে নিয়ে খুব চিন্তা করেন, তবে তারা মনে করেন যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর বুদ্ধির ওই ঘাটতি পূরণ হয়ে যাবে। তাই ছেলের সঙ্গে ওরা সর্বদা সহানুভূতি ও ধৈর্যের সঙ্গে আচরণ করতেন।

একদিন সাবুরোর বাবা ছেলেকে বললেন, সাবুরো, আজ ক্ষেতের কাজে তোমার সাহায্য আমার দরকার হবে। এখন ক্ষেতে গিয়ে মাটি খুঁড়ে এক ঝুড়ি আলু তুলবে, তারপর সেগুলি ভালো করে ঝেড়ে রোদে শুকোতে দেবে।'

সাবুরো বলল, 'বুঝতে পারছি, বাবা। সে তার কাস্তে আর নিড়ানি হাতে নিয়ে মাঠ চলে গেল।

সাবুরো খুব মন দিয়ে মাটি খুঁড়ে আলু বের করে আনে। এমন সময় হঠাৎ তার কাস্তে মাটির ভেতর একটা শক্ত বস্তুর গায়ে গিয়ে আঘাত কারে। সে কৌতূহলী হয়ে আরো গভীরে খুঁড়তে থাকে। সে দেখল যে, মাটির মধ্যে একটা তামার পাত্র পোঁতা আছে। ওটা তুলে এনে ভেতরে তাকাতেই দেখল, পাত্রের মধ্যে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা রাখা আছে। কেউ একজন বহুকাল আগে এই বিপুল ধনরাশি এখানে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল।

সাবুরো আপন মনে বলল, 'বাবা বলে দিয়েছেন, মাটি খুঁড়ে যা পাব তা রোদে শুকোবার জন্য বিছিয়ে দিতে হবে।' অতএব সে খুব যত্নের সঙ্গে স্বর্ণ মুদ্রাগুলি মাটিতে বিছিয়ে দিল। বাড়ি ফিরে সে তার বাবা-মাকে জানাল যে, সে মাটির মধ্যে অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছে। সে মুদ্রাগুলি রোদে শুকোবার জন্য মাটির উপর বিছিয়ে দিয়েছে।

সাবুরোর বাবা-মা ছেলের কথা শুনে অবাক হয়ে যান। তারা সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে ছুটে যান, কিন্তু ততক্ষণে কোনো একজন এসে স্বর্ণমুদ্রাগুলি তুলে নিয়ে গেছে। একটি মুদ্রাও সেখানে পড়ে নেই। তারা ছেলেকে বললেন, 'শোনো বাবা, এরপর এরকম কিছু পেলে তা খুব যত্ন করে কাপড়ে মুড়ে বাড়ি নিয়ে আসবে, মাঠে ফেলে রেখে এসো না। ভুলো না যেন।' সাবুরো বলল, 'ঠিক আছে বাবা, আমি বুঝতে পারছি।'

পরদিন সাবুরো মাঠে গিয়ে দেখল, একটা মরা বেড়াল পড়ে আছে। কী দুর্গন্ধ! সাবুরো বেড়ালটা খুব যত্ন সহকারে গামছায় মুড়ে বাড়ি নিয়ে আসে। মনে মনে তার খুব গর্ব হয়, বাবার কথা সে ভোলেনি। কিন্তু বাড়িতে ফেরার পর তার কাণ্ড দেখে বাবা বললেন, 'আহ সাবুরো এত বোকা হয়ো না। শোনো, এবার মাঠে এই রকম কিছু পেলে আগে সেটাকে পাশের নদীর জলে খুব ভালো করে ধুয়ে নেবে।'

পরদিন সাবুরো মাঠে গিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটা গাছের বেশ বড় গুঁড়ি পেল। বাবা বেড়ালের ব্যাপারে কী বলেছিলেন তার মনে পড়ে। সে গুঁড়িটা ঠেলতে ঠেলতে নদীর কাছে নিয়ে একটা জোর ধাক্কা দিয়ে নদীতে ফেলে দিল। সশব্দে নদীর পানি চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।

ঠিক তখনই এক পড়শি নদীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে ছেলেটির কাণ্ড দেখে বলল, 'এ কী করলে তুমি, ছেলে? এসব খুব দামি জিনিস। তুমি এই গুঁড়িটা টুকরো টুকরো করে কেটে যদি বাড়ি নিয়ে যেতে, তাহলে খুব ভালো জ্বালানি কাঠ হত।'

সাবুরো বলল, 'বুঝতে পারছি।' বাড়ির দিকে যাবার পথে সে দেখল যে, রাস্তার পাশে একটা চায়ের পট ও একটা চায়ের পেয়ালা পড়ে আছে। সাবুরো সঙ্গে সঙ্গে তার হাতিয়ার বের করে সেগুলি খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে, তারপর ভাঙা অংশগুলি গামছায় বেঁধে বাড়ি নিয়ে আসে।

বাড়িতে ঢুকেই সে উচ্চকণ্ঠে মাকে বলল, 'দ্যাখো মা, আজ কী পেয়েছি আমি।'

সাবুরোর মা মাথায় হাত দিয়ে করুণকণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, 'ওহ সাবুরো, এ কী করেছ তুমি! আমি ওই নতুন চায়ের পট ও পেয়ালা তোমার বাবার জন্য আজই কিনে এনেছিলাম। আজ তার দুপুরের খাবার সময় এগুলি সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা ছিল। এখন তুমি সব ভেঙে চুরমার করে দিলে!'

পরদিন সাবুরোর বাবা-মাতাকে লক্ষ করে বললেন, 'তুমি কোনো কাজই ঠিকমতো করতে পারো না। আজ তুমি বাড়িতে থাকো, ঘরের কাজকর্ম দ্যাখো। আজ আমরা মাঠে কাজ করব।'

বাবা-মাচলে গেলে সাবুরো গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকে আর মনে মনে বলে, 'আমাকে যা বলা হয় আমি তো সব সময় তা-ইকরি। তাহলে কেন সবাই আমাকে হাঁদারাম সাবুরো ডাকে!'

ক্ষুদে এক ইঞ্চি

স্বামী-স্ত্রী দু'জনই ছিল খুব ভালো মানুষ। তাদের কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। একদিন তারা মন্দিরে গিয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাল, 'আমাদের একটা বাচ্চা দিন, প্রভু। একটা সন্তানের জন্য আমরা আকুল হয়ে আছি।'

মন্দির থেকে বাড়ি ফেরার পথে তারা একটা ঘন ঘাসের গুচ্ছের কাছে আসতেই খুব ক্ষীণ গলায় একটি শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পেল। নিচু হয়ে ভালো করে দেখতেই তারা ঘাসের মধ্যে একটি কচি বাচ্চাকে দেখতে পেল। একটা ঝলমলে লাল কম্বলে জড়ানো এতটুকুন একটা শিশু। স্বামী-স্ত্রীকৃতজ্ঞ অন্তরে বলল, 'আমাদের প্রার্থনার উত্তরে দেবতা দয়া করে এই শিশুকে আমাদের দান করেছেন।'

তারা শিশুটিকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আপন সন্তানের মতো পালন করতে থাকে।

শিশুটি ছিল অসম্ভব ছোট। লম্বায় ছিল একটা মানুষের বুড়ো আঙুলের মতো। তার বয়স বাড়ে, কিন্তু তখনো সে এক ইঞ্চিই থেকে যায়। তাই সবাই তার নাম দেয় ক্ষুদে এক ইঞ্চি।

বেশ কিছুটা বয়স বাড়ার পর একদিন ক্ষুদে এক ইঞ্চি তার বাবা-মাকে উদ্দেশ করে বলল, 'আপনারা আমাকে খুব যত্ন করে ভালোভাবে বড় করে তুলেছেন, কিন্তু এবার আমাকে আপন পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমি এবার বাইরের পৃথিবীতে পা বাড়াব, আমি আমার নিজের ভাগ্য নিজে গড়ব।'

স্বামী-স্ত্রীতাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল, বলল যে, সে খুবই ছোট, বাইরের বিশাল পৃথিবীর বুকে বেরিয়ে পড়া তার পক্ষে ঠিক হবে না। কিন্তু ক্ষুদে এক ইঞ্চি কোনো কথাই শুনবে না। তাখন তারা বলল, 'ঠিক আছে। তোমাকে তৈরি হতে আমরা সাহায্য করব।' তারা ওকে একটা সূঁচ, একটা চালের বোল আর একটা চপস্টিক দিল। সূঁচ হবে তার তরবারি, গামলা হবে তা নৌকা, আর চপস্টিক হবে তার বৈঠা।

ক্ষুদে এক ইঞ্চি তার নৌকায় উঠে বাবা-মাকেহাত নেড়ে বিদায় জানাল, বলল যে, সে তার ভাগ্য ফিরিয়ে অনেক ধনসম্পদ নিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে। সে তার চপস্টিক দিয়ে বৈঠা চালাতে চালাতে তার ভাতের বোলের নৌকা নিয়ে নদীর বুকে ভাসতে ভাসতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে অনেক দূর চলে যায়। এমন সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটল। একটা ব্যাঙ তার নৌকার গায়ে গিয়ে পড়ে, আর তখনই নৌকা উল্টে যায়। কিন্তু ক্ষুদে এক ইঞ্চি ছিল খুব ভালো সাঁতারু। সে দ্রুত সাঁতার কেটে নদীর তীরে পৌঁছে যায়। সেখানে সে দেখল যে, সে এক জমিদারের বিশাল বাড়ির সিংহ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ক্ষুদে এক ইঞ্চি মনে মনে বলল, ইনি নিশ্চয়ই খুব বড়লোক হবেন। সে নির্ভীক চিত্তে দরজার কাছে গিয়ে ঘণ্টা বাজাল। একটু পরেই এক ভৃত্য এসে দরজা খুলল। কিন্তু কোথাও কাউকে না দেখে সে বেশ অবাক হয়।

তখন ক্ষুদে এক ইঞ্চি বলল, 'এই যে আমি এখানে। নিচের দিকে তাকাও, নিচের দিকে।'

ভৃত্য নিচের দিকে তাকাল, প্রথমে তার চোখে পড়ল শুধু তার প্রভুর কাঠের চটি জোড়া। তিনি ওই জুতো পরে রোজ হাঁটতে যান। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখার পর ভৃত্য দেখল যে, ওই জুতো জোড়ার পাশে ক্ষুদে এক ইঞ্চি দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে ভৃত্য ভীষণ অবাক হয়ে যায়। সে তার প্রভুকে খবর দেবার জন্য ছুটে ভেতরে যায়।

গৃহকর্তা সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে, মাটির খুব কাছে ক্ষুদে এক ইঞ্চি গর্বিত ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে, তার কোমরের কাছে ঝুলছে তার সূঁচ-তরবারি। ভবনের প্রভু তাকে লক্ষ করে বললেন, 'এই যে ক্ষুদে যোদ্ধাপ্রবর, তা এখানে কি মনে করে আপনার আগমন?'

ক্ষুদে এক ইঞ্চি জবাব দিল, 'আমি আমার ভাগ্যের অন্বেষণে পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়েছি। আপনি আমাকে আপনার একজন প্রহরী করে নিলে আমি বাধিত হব। আমি ছোট হলেও আমার এই চমৎকার তরবারি দিয়ে আমি খুব ভালো লড়াই করতে পারি। আমাকে চাকরি দিলে আপনাকে তার জন্য কখনো অনুতাপ করতে হবে না।'

ক্ষুদে মানুষটার এই রকম সাহসী ও সগর্ব উক্তি শুনে জমিদারের খুব মজা লাগে। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, এখন ভেতরে চলো।'

এই জমিদার ছিলেন ছোটখাটো এক রাজা। তিনি এক ইঞ্চিকে ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'তুমি আমার মেয়ে রাজকুমারীর খেলার সাথি হবে।'

এই ভাবে ক্ষুদে এক ইঞ্চি রাজকুমারীর সঙ্গী হয়ে ওঠে। দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের জন্ম হয়। তারা রোজ একসঙ্গে পড়াশোনা করে, গল্প করে, খেলাধুলা করে। রাজকুমারী তার গয়নার বাক্সে ক্ষুদে এক ইঞ্চির জন্য একটা বিছানা পর্যন্ত পেতে দেয়।

একদিন ক্ষুদে এক ইঞ্চি আর রাজকুমারী রাজ-ভবনেরঅনতিদূরে একটা মন্দির পরিদর্শনে যায়। এমন সময় আচম্বিতে এক ভয়ঙ্কর সবুজ শয়তান তার জাদুর হাতুড়ি নিয়ে তাদের দু'জনের সামনে এসে হাজির হল। শয়তান রাজকুমারীকে দেখে তাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য তার দিকে ছুটে গেল।

ক্ষুদে এক ইঞ্চি চোখের পলকে তার সূঁচ-তরবারিকোমরের গোছ থেকে টেনে এনে সবুজ শয়তানের বুড়ো আঙুলের গায়ে খোঁচা দিতে থাকে। কিন্তু শয়তানের চামড়া এত শক্ত আর পুরু ছিল যে, সেখানে তার সূঁচ-তরবারি ঢুকতে পারে না। এবার ক্ষুদে এক ইঞ্চি শয়তানের গা বেয়ে উঠে নাকে তার অস্ত্র দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে। শয়তানের নাক ছিল খুব কোমল। বারবার সেখানে সূঁচের আঘাতে শয়তান

ব্যথায় কাতর হয়ে পড়ে। অবশেষে সে আর যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একটা চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে যায়। যাবার সময় সে তার জাদুর হাতুড়িটাও সঙ্গে নিতে পারে না।

রাজকুমারী ক্ষুদে এক ইঞ্চিকে প্রাণভরা ধন্যবাদ দেয়। তারপর সে জাদুর হাতুড়িটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'এবার আমরা এই হাতুড়িটাকে আমাদের ইচ্ছা পূরণের কথা বলতে পারি।' রাজকুমারী হাতুড়িটা বাতাসে দুলিয়ে বলল, 'প্লিজ, ক্ষুদে এক ইঞ্চিকে আরেকটু লম্বা করে দাও।' আর কী আশ্চর্য। রাজকুমারী তার হাতুড়ি দুলিয়ে তার প্রার্থনা জানায় এবং প্রতি প্রার্থনার সঙ্গে ক্ষুদে এক ইঞ্চি এক-একইঞ্চি করে লম্বা হতে থাকে। তারপর এক সময় রাজকুমারী আর ক্ষুদে এক ইঞ্চি লম্বায় সমান সমান হয়ে ওঠে।

ওরা দু'জন তখন খুশিমনে রাজ-ভবনেফিরে আসে। রাজা যখন শুনলেন ক্ষুদে এক ইঞ্চি কীভাবে তাঁর কন্যাকে সবুজ শয়তানের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, তখন তিনি তার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করেন।

আরো কয়েক বছর কেটে যাবার পর ক্ষুদে এক ইঞ্চি আর রাজকুমারীর বিয়ে হয় এবং তারা পরম সুখে তাদের জীবন অতিবাহিত করতে থাকে।

আঠালো পাইন গাছ

অনেক দিন আগে জাপানে এক তরুণ কাঠুরে ছিল। সে ছিল খুব গরিব কিন্তু তার হৃদয় ছিল অপরের জন্য মমতা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ; সে-মমতার অন্তর্ভুক্ত ছিল গাছ-গাছালিও। যখন সে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য বনে যেত তখন সে কখনো কোনো তাজা গাছের শাখা ভাঙত না। সে সব মরা গাছের শাখা জীর্ণ হয়ে মাটিতে পড়ে যেত, সে শুধু ওইসব ডাল-পালা কুড়িয়ে নিয়ে আসত। একটা গাছের ডাল ভাঙলে কী হয় তা ওই দয়ালু কাঠুরের জানা ছিল। তখন ওই গাছ থেকে টুপটুপ করে আঠালো রস ঝরে। তখন ওই রসকে মনে হয়ে গাছের অশ্রু। যেহেতু সে কোনো গাছকে ব্যথা দিতে চাইত না, সেহেতু সে কোনো গাছের ডাল জোর করে ভাঙত না।

একদিন ওই কাঠুরে একটা লম্বা পাইন গাছের নিচ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল–

'আমার কচি ডাল ভেঙেছে একটি লোক
আমার চোখে তাই জেগেছে অনেক শোক।'

কাঠুরে মাথা উঁচু করে উপরের দিকে তাকাতেই দেখল যে, হ্যাঁ, পাইন গাছ ঠিকই বলেছে, কোনো একজন বদ লোক ওই পাইন গাছের তিনটি কচি শাখা ভেঙে নিয়ে গেছে, আর সেখান থেকে টুপটুপ করে ঘন আঠালো রস ঝরছে।

তরুণ দয়ালু কাঠুরে মৃদুকণ্ঠে আপনমনে বলল, 'ওই শাখাগুলোর রক্তক্ষরণ আমি থামাব, আমি ওদের ক্ষতস্থান আমার কাপড় দিয়ে বেঁধে দেব।'

সে তার নিজের কাপড় ছিঁড়ে কয়েকটা ব্যান্ডেজ বানিয়ে গাছটির ভাঙা জায়গাগুলি সযত্নে মুড়ে দিতেই তার গা থেকে রস ঝরে পড়া বন্ধ হয়ে গেল। আর কী আশ্চর্য, তার বৃক্ষ পরিচর্যার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে কয়েকটা সোনা আর রূপার মুদ্রা ঝুরঝুর করে মাটিতে তার সামনে এসে পড়ল। কাঠুরে ভীষণ অবাক হয়ে যায়! সে তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। সে কি জেগে আছে, না স্বপ্ন দেখছে? মুখ তুলে সে পাইন গাছটিকে ধন্যবাদ দিল, তারপর মুদ্রাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তার বাড়িতে ফিরে এল।

এখন আর সে দরিদ্র নয়। অনেক স্বর্ণ-রৌপ্যমুদ্রার মালিক সে। তরুণ মমতাময় কাঠুরে মনে মনে পাইন গাছকে ধন্যবাদ দেয়।

এমন সময় তার জানালায় একটা মুখ দেখা দিল। তার প্রতিবেশী এক কাঠুরের মুখ। ওই কাঠুরে ছিল বদ স্বভারের। সে-ইপাইন গাছের তিনটি কচি ডাল ভেঙে এনেছিল তার জ্বালানির জন্য। সে তার প্রতিবেশী কাঠুরের হাতে সোনালি-রূপালি মুদ্রাগুলি দেখে অবাক হয়ে যায়। ব্যাপারটা কী তা সে জানতে চায়। সব কথা শুনে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি ওই খাড়া লম্বা পাইন গাছটার কথা বলছ?' দয়ালু তরুণ কাঠুরে 'হ্যাঁ' বলতেই অন্য কাঠুরেটি তৎক্ষণাৎ পড়িমরি করে বনের ভেতরে ছুটে গেল। তারও অনেক সোনালি-রূপালিমুদ্রা চাই।

সেই পাইন গাছটির নিচে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনতে পেল গাছটি বলছে–

'আঠালো-আঠালোএ রক্ত আমার অনন্যা
আমাকে ছুঁলেই তুমি পাবে প্রবল এক বন্যা।'

বদ কাঠুরে বলল, 'তাই তো আমি চাই, সোনালি-রূপালিমুদ্রার এক বন্যা।' সে হাত উঁচু করে গাছের আরেকটা কচি শাখা ভাঙল। পড়তে শুরু করল সোনালি-রূপালি মুদ্রা নয়, ঘন গাঢ় ভীষণ আঠালো রসের বন্যা। সেই রস বদ কাঠুরের চুলে মুখে হাতে পায়ে জালের মতো জড়িয়ে গেল। সে ওই আঠালো রসের জালে অথর্ব বন্দি হয়ে পড়ে রইল পরের তিনদিন। পাইন গাছের তিনটি ডাল ভাঙার শাস্তিস্বরূপ প্রতিটি ডালের জন্য একদিন করে। অবশেষে তিন দিন পর রস তরল হয়ে যায়, আর সে তার বন্দিদশা থেকে মুক্তি লাভ করে।

এরপর থেকে ওই কাঠুরে আর কখনো কোনো জীবন্ত গাছের ডাল ভাঙেনি।

পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
SEQAEP

তাঁতি মাকড়সা

বহুদিন আগে জাপানে ইয়োসাকু নামে এক তরুণ চাষি ছিল। একদিন জমিতে চাষ করার সময় সে দেখে যে, একটা সাপ একটা মাকড়সাকে গিলে খাবার জন্য এগিয়ে আসছে। মাকড়সাটির জন্য ইয়োসাকুর মনে করুণা জেগে ওঠে। সে তার কোদাল হাতে নিয়ে সাপটার দিকে এগিয়ে গিয়ে ওটাকে তাড়িয়ে দেয়।

মাকড়সাটা দ্রুত লতাপাতা আর ঘাসের গুচ্ছের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু তার আগে সে যেন এক মুহূর্তের জন্য থেমে তার মাথা নুইয়ে ইয়োসাকুকে ধন্যবাদ দিল, তার কৃতজ্ঞতা জানাল।

এর অল্প কয়েকদিন পর এক সকালে ইয়োসাকু শুনতে পায়, কে যেন তার দরজার বাইরে দঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকছে, 'ইয়োসাকু! ইয়োসাকু!' দরজা খুলতেই ইয়োসাকু দেখতে পায় যে, একটি সুন্দরী মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েটি বলল, 'আমি শুনলাম যে তোমাকে কাপড় বুনে দেয়ার জন্য তুমি একজন লোক খুঁজছ। তুমি কি আমাকে তোমার এখানে থাকতে দেবে? আমি তোমার জন্য খুব সুন্দর কাপড় বুনে দিতে পারব।'

এদিকে ইয়োসাকুর সত্যিই একজন সাহায্যকারীর দরকার হয়ে পড়েছিল। সে মেয়েটির প্রস্তাবে খুশি হয়ে সায় দিল। ওকে সে তাঁতঘরটা দেখিয়ে দিল। মেয়েটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁতে বসে তুলা দিয়ে কাপড় বুনতে শুরু করে দেয়। দিনের শেষে কতটুকু কাজ হয়েছে দেখার জন্য তাঁতঘরে ঢুকতেই বিস্ময়ে ইয়োসাকুর চোখ কপালে উঠে যায়। মেয়েটি আটটি খুব লম্বা বস্ত্রখণ্ড বুনে ফেলেছে, ওই কাপড় দিয়ে কমপক্ষে আটটা কিমোনো বানানো যাবে। কারো পক্ষে যে একদিনে এত কাপড় বোনা সম্ভব ছিল

ইয়োসাকুর কল্পনার বাইরে।

সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি একদিনে এত কাপড় কী করে বুনলে?'

মেয়েটি ইয়োসাকুর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, 'তুমি আর কখনো আমাকে এ প্রশ্ন করবে না। আর শোনো, আমি যখন এখানে কাজ করব তখন তুমি কখনো এ ঘরে ঢুকবে না। ঠিক আছে?'

কিন্তু ইয়োসাকুর কৌতূহল বাঁধ মানে না। সে একদিন পা টিপে টিপে তাঁতঘরের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল। যা দেখল তাতে সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তাঁতের সামনে যে বসে আছে সে ওই মেয়েটি নয়; একটা বিশাল আকারের মাকড়সা অত্যন্ত দ্রুতবেগে তার আট পা দিয়ে বুননের কাজ করে চলছে। সূতার পরিবর্তে সে ব্যবহার করছে তার নিজের মাকড়সার জাল, আর ওই জাল অনবরত বেরিয়ে আসতে থাকে তার মুখ দিয়ে।

ইয়োসাকু ভালো করে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকাতেই বুঝতে পারে যে, এটা সেই মাকড়সা যাকে সে সাপের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিল। তখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। মাকড়সাটা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ইয়োসাকুর জন্য কিছু করতে চেয়েছে। তাই সে নিজেকে একটি সুন্দরী মেয়েকে রূপান্তরিত করে তার জন্য কাপড় বুনে তার বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। তাঁতঘরে রাখা তুলা খেয়ে সে ওই তুলা দ্রুত সূতায় রূপান্তরিত করে, তারপর ওই সূতা দিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে কাপড় বুনে ফেলে।

মাকড়সার সাহায্যের জন্য ইয়োসাকু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করে। এদিকে সে দেখতে পায় যে, তাঁতঘরে সঞ্চিত তুলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তাই সে আরো তুলা কেনার জন্য পাহাড়ের ওপাশে নিকটবর্তী গ্রামে যায়। সে ওই গ্রামের বাজার থেকে একটা বড় তুলার বস্তা কিনে সেটা পিঠে নিয়ে বাড়ির পথে ফিরে চলল।

পথিমধ্যে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে। ক্লান্ত হয়ে ইয়োসাকু বিশ্রাম নেবার জন্য রাস্তার পাশে বসে। সে তার পিঠের বস্তা এক পশে নামিয়ে রেখেছিল। তার অলক্ষে সেই আগের সাপটা যাকে সে মাকড়সার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বস্তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। ইয়োসাকু বাড়ি ফিরে মেয়েটিকে তুলার বস্তাটা দেয়। ওর মধ্যে যে সাপ ঢুকে বসে আছে, ইয়োসাকু তার কিছুই জানে না।

মেয়েটি তুলা পেয়ে খুব খুশি হয়। সে বস্তাটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁতঘরে ঢুকে সে নিজেকে মাকড়সায় রূপান্তরিত করে তুলা খেতে করে। মাকড়সা খেয়েই চলে, খেয়েই চলে, সে বস্তার প্রায় তলানিতে এসে পৌঁছায়, এমন সময় সাপটা তুলার মধ্য থেকে লাফিয়ে উঠে সোজা তার দিকে ছুটে যায়।

মুখ হা করে সে মাকড়সাকে গিলে ফেলার জন্য তার দিকে এগিয়ে যায়। মাকড়সা-মেয়েভীষণ ভয় পায়। সে জানালা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে পড়ে। সাপও এঁকেবেঁকে তার পিছু নেয়। মাকড়সা এত বেশি পরিমাণ তুলা খেয়েছে যে, তার পক্ষে জোরে দৌড়ানো সম্ভব হয় না। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাপ মাকড়সার খুব কাছে চলে আসে। আবার সে বিরাট হা করে তাকে গিলে ফেলার চেষ্টা করে। আর ঠিক ওই সময় একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল।

সূর্য-দাদুততক্ষণে আকাশে উঠে গিয়েছিলেন। তিনি উপর থেকে সব কিছু দেখছিলেন। মাকড়সাটি যে ইয়োসাকুকে অনেক সাহায্য করেছে, সেটা তিনি জানতেন। বেচারা মাকড়সার জন্য তাঁর খুব মায়া হয়। তিনি নিচের দিকে একটা সূর্যরশ্মি পাঠিয়ে দিলেন। তখন মাকড়সার মুখ থেকে তার জালের একটা

অংশ সামান্য বেরিয়ে এসেছিল। রশ্মিটা নিজেকে সেখানে আটকে নেয়, আর তখন সূর্য-দাদুখুব আস্তে আস্তে মাকড়সাকে আকাশের বুকে তাঁর কাছে টেনে নিলেন। সাপের পক্ষে সেখানে পৌঁছুনোর কোনো উপায় ছিল না।

সাপের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য মাকড়সা সূর্য-দাদুর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়। সে তখন তার দেহের অভ্যন্তরে যত তুলা ছিল সেগুলি দিয়ে উঁচু আকাশের বুকে তুলার মতো হালকা মিহি মনোরম মেঘমালা তৈরি করে দিল।

এজন্যই আমরা বলি যে, মেঘমালা তুলার মতো কোমল ও সাদা, আর এজন্যই জাপানের মাকড়সা আর মেঘের একই নাম– কুমো।

দাঁত খিলালের ক্ষুদে যোদ্ধারা

একদা এক সুন্দরী রাজকুমারী ছিলেন। কিন্তু তার একটা খুব খারাপ অভ্যাস ছিল। রোজ রাতে ঘুমাতে যাবার আগে তিনি একটা খিলাল দিয়ে তার দাঁত খুটতেন। এটা তেমন খারাপ কিছু ছিল না। কিন্তু রাজকুমারী দাঁত খোঁটার পর খিলালটা ফেলে না দিয়ে যে খড়ের বিছানায় তিনি ঘুমাতেন, তার ফাঁকে গুঁজে রাখতেন। এটা খুব একটা পরিচ্ছন্ন অভ্যাস ছিল না। ব্যবহৃত খিলালগুলি তার বাইরে ফেলে দেয়া উচিত ছিল। এদিকে রোজ রাতে তার খড়ের শয্যার ফাঁকে ফাঁকে খিলালগুলি গুঁজে রাখার ফলে একসময় রাজকুমারীর বিছানা খিলালে খিলালে পূর্ণ হয়ে যায়।

এই সময় এক রাতে রাজকুমারী নানা হৈচৈ শব্দ শুনে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। কারা যেন প্রচণ্ড শোরগোল তুলে লড়াই করছে। তিনি যোদ্ধাদের চিৎকার আর তরবারির ঘর্ষণের শব্দ শুনলেন। রাজকুমারী মহাভয় পেয়ে তার বিছানায় উঠে বসে শয্যার পাশের ছোট বাতিটি জ্বালালেন। বাতির আলোয় তিনি যা দেখলেন তাতে রাজকুমারী নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি কি জেগে আছেন, না স্বপ্ন দেখছেন? রাজকুমারী সজোরে তার হাতে চিমটি কাটলেন। না স্বপ্ন নয়, তিনি যা দেখেছেন তা নির্জলা সত্য।

তিনি চোখ বড় বড় করে দেখলেন যে, অনেক ক'জন ক্ষুদে যোদ্ধা মহাকলরব করে লড়াই করে চলেছে। তারা রাজকুমারীর দিকে তাকায় না, তাকে কোনোরকম বিরক্ত করে না, কিন্তু তাদের হৈচৈ শব্দে রাজকুমারী ঘুমাতে পারে না। ভোরের দিকে তার একটু তন্দ্রার মতো আসে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠে রাজকুমারী দেখেন যে, চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ, কোথাও কোনো সড়াশব্দ নেই, ক্ষুদে যোদ্ধারা উধাও হয়ে গেছে।

রাজকুমারী খুব অবাক হন, বেশ ভয়ও পান। বাবাকে বলার সাহস তার হয় না। তিনি জানেন, বাবা তার কথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু রাতের পর রাত একই ঘটনা ঘটে চলে। ক্ষুদে যোদ্ধাদের চেঁচামেচির কারণে রাতে রাজকুমারীর একবিন্দু ঘুম হয় না। রাজকুমারীর দেহ শীর্ণ ও মুখ পাণ্ডুর হয়ে যায়।

রাজা কন্যাকে বারবার জিজ্ঞাসা করেন, কী হয়েছে তার, কেন সে এ রকম শুকিয়ে যাচ্ছে। শেষে রাজকুমারী বাবাকে সব কথা খুলে বলেন। রাজা বললেন, ঠিক আছে, তিনি নিজে ওই ঘরে রাত কাটাবেন এবং নিজের চোখে দেখবেন কী ব্যাপার।

সেদিন রাজা রাজকুমারীর ঘরে রাত কাটালেন। তিনি সারা রাত জেগে বসে থাকেন কিন্তু ক্ষুদে যোদ্ধারা সে রাতে দেখা দেয় না।

তবে রাজা একটা জিনিস দেখতে পান। তিনি দেখলেন যে, দাঁত খুঁটবার একটা খিলাল রাজকুমারীর খড়ের শয্যার মধ্যে গোঁজা আছে। তিনি সেটা হাতে তুলে নিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে তা দেখলেন। তারপর পরদিন সকালে তিনি রাজকুমারীকে তার কাছে ডেকে পাঠালেন।

রাজা বেশ কয়েকটা খিলাল দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি রাজকুমারীকে একটা খিলাল দেখালেন। তার গায়ে অনেক কাটাকুটি দাগ। কিন্তু দাগগুলি ছিল এত ছোট এবং সরু যে রাজকুমারী সেগুলি প্রায় দেখতেই পান না। তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সবের অর্থ কী, বাবা?'

রাজা মেয়েকে বললেন যে, ওই ক্ষুদে যোদ্ধারা তার ব্যবহৃত খিলালগুলি দিয়ে যুদ্ধ করার জন্যই তার ঘরে এসে জড়ো হয়। ওই যোদ্ধাদের নিজেদের কোনো তরবারি ছিল না, তাই রাজকুমারীর খিলালকেই তারা তাদের তরবারিরূপে ব্যবহার করত। সেজন্যই তারা রোজ রাতে রাজকুমারীর ঘরে হানা দিত। ওরা গত রাতে আসেনি, কারণ সে রাতে রাজা ছিলেন ওই ঘরে এবং রাজাকে তারা ভয় পায়।

রাজা মেয়েকে এ কথা বলার পর তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তো তোমার ঘরে এত দাঁতের খিলাল এল কেমন করে?'

রাজকুমারী তার বদঅভ্যাসের জন্য খুব লজ্জা পান। তিনি বাবাকে বললেন যে, অলসতার জন্য তিনি খিলালগুলি বাইরে না ফেলে দিয়ে নিজের বিছানায় গুঁজে রাখতেন। কিন্তু এ রকম কাজ তিনি আর করবেন না।

তারপর রাজকুমারী তার খড়ের বিছানার ফাঁক থেকে সব খিলাল একটা একটা করে তুলে বাইরে নিয়ে গিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। সে-রাতেক্ষুদে যোদ্ধারা আর তার ঘরে এল না। কী দিয়ে যুদ্ধ করবে তারা? তারা কোথাও তাদের খিলাল-তরবারিদেখতে পেল না। তারা আর কখনো রাজকুমারীর ঘরে আসে না। রাজকুমারীর ঘুমের কোনো ব্যাঘাতও আর ঘটে না।

অল্প সময়ের মধ্যে রাজকুমারী আবার তার সুন্দর স্বাস্থ্য ফিরে পান। তার সকল কাজ এখন খুব পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়। ক্ষুদে যোদ্ধাবৃন্দ আর তাদের হৈ-হুল্লোড়েরকথা রাজকুমারী ভোলেন না। আর তিনি যদি কখনো খিলাল ব্যবহারও করেন, তোমরা নিশ্চিত থাকতে পারো যে, তিনি সেটা ব্যবহারের পর বাইরে দূরে ছুড়ে ফেলে দিতেন।

চাঁদের বুকে খরগোশ

চাঁদের বুড়ো একদিন একটা বড় অরণ্যের ওপর দিয়ে ভেসে যাবার সময় নিচের দিকে তাকাল। সে দেখল যে, নিচে মাটির বুকে একটা খরগোশ, একটা বানর আর একটা শেয়াল মিলেমিশে মহাআনন্দে জীবনযাপন করছে।

চাঁদের বুড়ো ওদের দেখে আপন মনে বলল, 'এদের মধ্যে কে সব চাইতে দয়ালু? অপরের দুখে কার হৃদয় সব চাইতে বেশি কাতর হয়? যাই, একটু দেখে আসি।'

সে নিজেকে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক-এ রূপান্তরিত করে বনের মধ্যে ওই তিন বন্ধুর সামনে এসে উপস্থিত হল। সে কাতরকণ্ঠে ওদের উদ্দেশে বলল, 'বাবারা, এই বুড়ো ভিখারিকে একটু দয়া করুন। আমি অনেকক্ষণ কিছু খাইনি। দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দিন।

তিন বন্ধু সমস্বরে বলল, 'আহা, বেচারা!' তিনজনই ওর জন্য খাবার যোগাড় করতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

বানর অনেকগুলো বাদাম ও অন্যান্য ফল এনে বুড়োকে দিল। শেয়াল একটা বড় মাছ ধরে বুড়োকে তা খেতে দিল। কিন্তু খরগোশ কোথাও কিছু খুঁজে পেল না।

খরগোশের খুব মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরই তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। সে বানরকে বলল, 'ভাই বানর, তুমি বনের ভেতর থেকে আমার জন্য কিছু জ্বালানি কাঠ নিয়ে এসো।' তারপর সে শেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাই

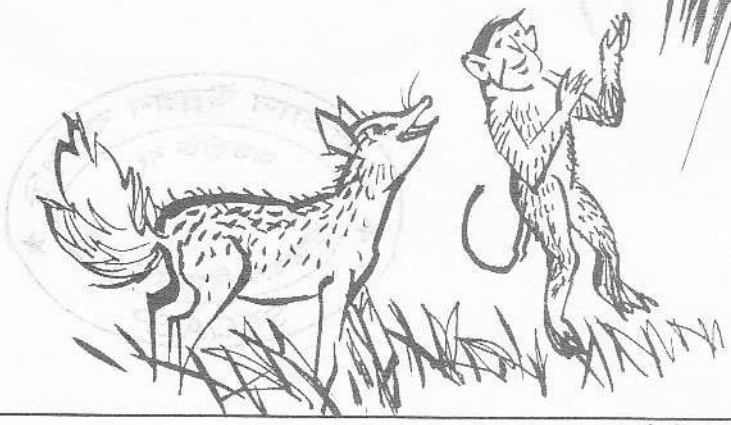

শেয়াল, তুমি দয়া করে এই জ্বালানি কাঠগুলো দিয়ে আমাকে একটা বড় আগুনের কুণ্ড বানিয়ে দাও।'

তাদের বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করে বানর আর শেয়াল অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে দেয়। খরগোশ তখন বুড়ো ভিক্ষুকের কাছে গিয়ে বলল, 'দ্যাখো, তোমাকে দেবার জন্য আমি কিছুই জোগাড় করতে পারিনি, কিন্তু তাতে কি? আমি এখন আমার নিজেকে এই আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করব। খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেলে তুমি আমাকে রোস্ট বানিয়ে খেতে পারবে।' এই বলে খরগোশ যেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে বুড়ো ভিখারি আবার তার আসল রূপে ফিরে যায়। সবাই দেখতে পায় যে, ওই ভিখারি আর কেউ নয়– চাঁদের বুড়ো।

চাঁদের বুড়ো খরগোশকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'খরগোশ সোনামণি, তোমার বুকে অসম্ভব দয়া-মায়া। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে, দয়া দেখাতে গিয়ে নিজেকে ধ্বংস করার দরকার নেই। আমি দেখলাম যে, তোমাদের তিনজনের মধ্যে তুমিই সব চাইতে দয়ালু। চলো, আমার সঙ্গে চলো। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।'

চাঁদের বুড়ো খরগোশকে বুকে নিয়ে চাঁদে উঠে গেল। খরগোশ এখন চাঁদেই থাকে। ঝকঝকে চাঁদের মধ্যে তোমরা এখন যে অস্পষ্ট একটা জায়গা দ্যাখো, সেটা আর কিছু নয়, আর কেউ নয়, সেটা ওই খরগোশ।

পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি নং:
বাস্তবায়নে: বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
SEQAEP

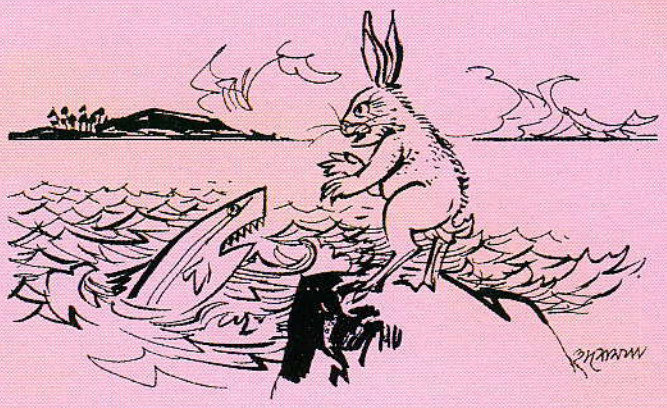

জাপানি শিশুতোষ লোকগল্প

কবীর চৌধুরী

বাশিশুএ ৭৩১

প্রকাশক : মো. নূরুজ্জামান, পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, দোয়েল চত্বর সড়ক, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণে : ক্রিডেন্স প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, ১৭ বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০। প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৪১৫, ফেব্রুয়ারি ২০০৯। দ্বিতীয় প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, মে ২০১৩। প্রচ্ছদ ও ছবি : হাশেম খান। মূল্য : ৬৫.০০

JAPANI SHISHUTOSH LOKGOLPA (Japanese Children's Favorite Stories) By KABIR CHOWDHURY. Publisher : Md. Nuruzzaman, Director, Bangladesh Shishu Academy, Doyel Chattor Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Date of Publication : February 2009, Second Edition : May 2013. Cover & Illustration : Hashem Khan.
Price : Tk. 65.00
US $ 4.00

ISBN : 984-70076-0731-0

সেকায়েপ

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর পাঠ্যভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।

বিক্রির জন্য নয়